ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ▪ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

মহান ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্ব

ভাষা সংগ্রাম স্বাধীনতার প্রেরণা

গণতন্ত্র দরকার, উন্নয়নও প্রয়োজন

প্রথম শহিদমিনার

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে,
লেখা ও মতামত পাঠাবে।
এখন মোবাইল অ্যাপে
পাওয়া যাচ্ছে।

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 38, No. 08, February 2018, Tk. 25.00

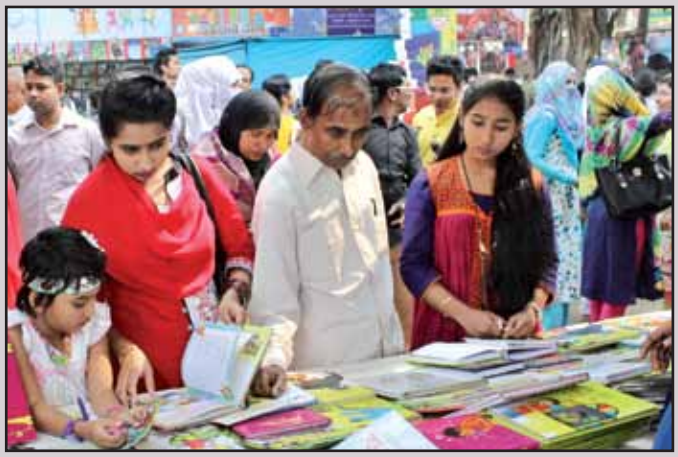

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪

১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত প্রথম শহিদমিনার

সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এ দিনে মাতৃভাষায় কথা বলা, লেখাপড়া করা তথা মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলার ছাত্র-জনতা। মায়ের ভাষা 'বাংলা'-কে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে একাত্ম হয়েছিল বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সে আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছিল সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিকসহ অনেকে। বীর বাঙালি একতাবদ্ধ হয়েছিল একটি দাবিতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্বত্রই একই দাবি– আমরা বাঙালি, বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলায় আমি কথা বলতে চাই। এভাবেই সেদিন বাঙালির স্বকীয় জাতিসত্তার চেতনা আরেকবার জেগে উঠেছিল। যার পথ ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে এই জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। মা আর মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির ভালোবাসা মিশ্রিত এই আবেগ ও আত্মত্যাগকে জাতিসংঘ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে। ভাষার মাসে মহান একুশের প্রাক্কালে আজ ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ, ভাষা সৈনিক ও সকল ভাষা সংগ্রামীর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠেছিল ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পূর্বেই। আর বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৫৪ সালের ৭ মে। তাই ভাষার সংগ্রাম দীর্ঘ হয়েছিল। এ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তমুদ্দুন মজলিশ ও প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমসহ সারা বাংলার সচেতন জনতা। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পাঠকদের জন্য এ সংখ্যায় 'ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্ব', 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু', শিরোনামে লেখাসহ ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এবং এ বছর একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক রণেশ মৈত্র-এর লেখা নিবন্ধ ছাপানো হলো।

দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও মূল্যবোধকে রক্ষা করার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষম ও টেকসই উন্নয়নও নিশ্চিত করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পর পর দুই মেয়াদে বিগত ৯ বছরে সেই চেষ্টাই করে গেছে। তার ওপর ভিত্তি করে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর সাবেক সিনিয়র সম্পাদক ড. মোহাম্মদ হাননান রচিত 'গণতন্ত্র দরকার, উন্নয়নও প্রয়োজন' বিশেষ নিবন্ধটি এ সংখ্যায় মুদ্রণ করা হলো।

এছাড়া রয়েছে কবিতা ও নিয়মিত প্রতিবেদন। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ
ভাষা সংগ্রাম স্বাধীনতার প্রেরণা ৪
আহমদ রফিক
নিবন্ধ
ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্ব ৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন
বিশেষ নিবন্ধ
গণতন্ত্র দরকার, উন্নয়নও প্রয়োজন ৯
ড. মোহাম্মদ হাননান
নিবন্ধ
প্রথম শহিদমিনার ১৭
এম আর মাহবুব
নিবন্ধ
ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু ২০
শামসুজ্জামান শামস
নিবন্ধ
ভাষা আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : নারীর প্রজ্ঞা ২২
সেলিনা হোসেন
প্রবন্ধ
অমর একুশে এক অবিনাশী চেতনা ২৫
মো. নূরুল হক
নিবন্ধ
ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক তাৎপর্য ২৭
রণেশ মৈত্র
ফিচার
একুশে বইমেলার ই-তথ্য কেন্দ্র ২৯
মো. শাহেদুল ইসলাম
প্রবন্ধ
ঘুড়ি ৩১
সোহরাব পাশা
নিবন্ধ
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ ভাবনা ৩৩
ড. তিমির মজুমদার
প্রবন্ধ
শব্দদূষণের বিরূপ প্রভাব
মোস্তফা কামাল পাশা ৩৭
ফিচার
রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সহিংসতা ৩৯
মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

হাইলাইটস

প্রবন্ধ
ছবির মানুষ হীরালাল সেন : জীবন ও চলচ্চিত্র ৪০
বশিরুজ্জামান বশির
প্রবন্ধ
বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৪২
হাবিবুর রহমান স্বপন
রম্য রচনা
উচ্চারণ বিভ্রাট ৪৪
এম কিউ জামান
কবিতাগুচ্ছ
মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, দেলোয়ার হোসেন
মোহাম্মদ ইলইয়াছ, রীনা তালুকদার ১৯
জাকির আবু জাফর, আবুল হোসেন আজাদ
কনক চৌধুরী, বিমল কৃষ্ণ রায় ২৪
বাতেন বাহার, দুলাল সরকার, ফরিদ আহমেদ হৃদয়
অসিত কুমার মণ্ডল, মুহাম্মদ ইসমাঈল ৩০
খান চমন-ই-এলাহি, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, আতিক আজিজ
মতিন বৈরাগী, মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ ৩২
মনসুর জোয়ারদার, শামসুল করীম খোকন
রুস্তম আলী, সঞ্চারী হক, রফিকুল হক ৪৬
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫১
আন্তর্জাতিক ৫৩
উন্নয়ন ৫৩
শিক্ষা ৫৪
সংস্কৃতি ৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৬
কৃষি ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
শিল্প-বাণিজ্য ৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৬০
নিরাপদ সড়ক ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১
স্বাস্থ্যকথা ৬২
মাদক ৬৩
চলচ্চিত্র ৬৪

ভাষা সংগ্রাম স্বাধীনতার প্রেরণা

জাতিসত্তার সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রের শক্তিতে মাতৃভাষা সমাজ-মানসে শিকড় প্রসারিত করে থাকে। ভাষা তার ব্যবহারিক ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে নীতিবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে উদ্ভাবনী, নান্দনিকতা ও মননশীলতারও প্রতিফলন ঘটায়। সামাজিক পটভূমিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতির তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক বিকাশে ভাষার ভূমিকা অনন্য। ভাষা তাই সামাজিক অগ্রগতির ধারক-বাহক। আবার সামাজিক বিকাশও ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষের পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। ভাষার এই শক্তি, সামর্থ্য ও সামাজিক ভূমিকার বৈশিষ্ট্যগত রূপ তৈরি করে ভাষিক জনগোষ্ঠী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে ভাষার পরিচয়, কখনো বা ভূখণ্ড পরিচয়ের সঙ্গে জাতিসত্তা ও ভাষাসত্তার পরিচয় চিহ্নিত হতে দেখা যায়। ভাষার পরিচয় কখনো জাতিকে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় অর্জনের পথ দেখায়। কখনো ভূখণ্ডের রাজনৈতিক চরিত্র বদলের পর তার নয়া জাতিও ভাষার পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। ভূখণ্ড, জাতি ও ভাষা এভাবে নানাদিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ উপলক্ষে ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক-এর 'ভাষা সংগ্রাম স্বাধীনতার প্রেরণা' নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

গণতন্ত্র দরকার, উন্নয়নও প্রয়োজন

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। কেন এমন কথা বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু? আমরা হয়ত ভুলে গেছি, সেদিন আমাদের কিছুই ছিল না। রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট যা ছিল তাও পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণের পূর্বে সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমনকি তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক)-এর সব টাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। আন্তর্জাতিক এজেন্টরাও বসে ছিল না। তখন বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ Just Faaland এবং J.R Parkinson ঢাকায় এসে বলল, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন! এমন দেশের আবার উন্নয়ন হয় নাকি! যদি এমন দেশের উন্নয়ন হয়, তাহলে দুনিয়ার সব দেশই উন্নত হবে। যদি বাংলাদেশের উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত হয়ই, তাহলেও ২০০ বছর সময় লাগবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন হলো পৃথিবীর কঠিনতম এক সমস্যা'। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আত্মপ্রত্যয়ী জাতির প্রতিনিধি হয়ে সেই কঠিনতম সমস্যার কাছে মাথা নোয়ালেন না। তিনি এদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ, মধ্যম আয়ের দেশ ও উন্নত দেশে পরিণত করার সংগ্রামে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজেদের টাকাতেই পদ্মা সেতুর মতো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখালেন তিনি জাতিকে। এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে জাতির সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে লিখিত বিশেষ নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯

প্রথম শহিদমিনার

শহিদমিনার আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৫২ সালের পর থেকে শহিদমিনার আমাদের সকল গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একমাত্র আশ্রয় ও উৎসস্থল হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। শহিদমিনার আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি হাসি-কান্নার ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী, আমাদের অস্তিত্বের প্রহরী। তাছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর শহিদমিনার আমাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে। শহিদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যই শহিদমিনার নির্মাণের কথা চিন্তা করা হয়। ঢাকায় প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এক রাতের যৌথ শ্রমে। ভাষা গবেষক এম আর মাহবুব রচিত 'ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদমিনার' নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৭

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

ভাষা সংগ্রাম স্বাধীনতার প্রেরণা

আহমদ রফিক

ভাষা ভাব প্রকাশ ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। এছাড়াও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে ভাষার রয়েছে নানামাত্রিক গভীর সম্পর্ক। নৃ-বিজ্ঞানীদের বিচারে 'ভাষা তথা মাতৃভাষা সেই ভাষিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির অংশ'। মানুষের খাদ্যাভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচার, আচরণ, রীতি, প্রথা ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যের মতো বহুকিছু সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা প্রকৃতপক্ষে এক গভীর সম্পর্কসূত্রে বাঁধা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান–পিআইডি

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষ শৈশবে প্রধানত মায়ের মুখ থেকে ভাষার প্রথম পাঠ নেয় বলে সেই ভাষা হয়ে ওঠে তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষা তাই জনগোষ্ঠী ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্ব শেষে সেই ভাষা নানাভাবে শেখা ও শেখানো হয়। মাতৃভাষা তার উৎস ও চরিত্রগুণে 'প্রথম ভাষা' হিসেবে স্বীকৃত। ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে, মাতৃভাষা যতটা সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে শেখা যায় ভিনজাতির ভাষা তথা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষা ততটা সহজে শেখা যায় না; যদিও মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে সেগুলোতে পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়। অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে ওইসব ভাষা আয়ত্ত করা গেলেও শিকড়-ছোঁয়া সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে না।

একসময় রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ ভাষা ছিল লাতিন (যাকে বলা হয় 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা') এবং পূর্বাংশের ভাষা গ্রিক। কিন্তু কালক্রমে রোমান প্রভাব ও আধিপত্য খর্ব হওয়ার ফলে ধর্মীয় যোগসূত্রের জাদু সত্ত্বেও লাতিনের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। যদিও মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে লাতিন ছিল শিক্ষিত শ্রেণির ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা এবং স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষণীয় ভাষা। তবু ওই অঞ্চলে স্থানিক ভাষা তথা যার যার মাতৃভাষা তার ন্যায্য মর্যাদার আসন ঠিক করে নেয়। যেমন- ইংরেজির পর দ্বাদশ শতকের কিছুকাল পর আসে ফরাসি ভাষা, তার সংগঠিত লিখিত রূপের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। আসলে জাতিসত্তার সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রের শক্তিতে মাতৃভাষা সমাজ-মানসে শিকড় প্রসারিত করে থাকে। ভাষা তার ব্যবহারিক ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে নীতিবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে উদ্ভাবনা, নান্দনিকতা ও মননশীলতারও প্রতিফলন ঘটায়। এককথায় সামাজিক পটভূমিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতির তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক বিকাশে ভাষার ভূমিকা অনন্য। ভাষা তাই সামাজিক অগ্রগতির ধারক-বাহক। আবার সামাজিক বিকাশও ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষের পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। এরা নিঃসন্দেহে পরস্পর-নির্ভরশীল এক মিথস্ক্রিয়ার অংশ।

ভাষার এই শক্তি-সামর্থ্য ও সামাজিক ভূমিকার বৈশিষ্ট্যগত রূপ তৈরি করে ভাষিক জনগোষ্ঠী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে ভাষার পরিচয়, কখনোবা ভূখণ্ড পরিচয়ের সঙ্গে জাতিসত্তা ও ভাষাসত্তার পরিচয় চিহ্নিত হতে দেখা যায়। যেমন- ইংল্যান্ডের অধিবাসী ইংরেজের ভাষা ইংরেজি বা ফরাসিদের ভাষা ফরাসি। আরব ভূ-খণ্ডের আরবদের ভাষা আরবি আর বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। কখনো ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক চরিত্র বদলের পর তার নয়া পরিচয় জাতি ও ভাষার পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। ভূখণ্ড জাতি ও ভাষা এভাবে নানাদিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভাষার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিলেতি বিশ্বকোষে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, ভাষা তার আপন শক্তিতে জাতিরাষ্ট্র ও জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অন্তর্নিহিত সংহতি রক্ষা করে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্য রক্ষা ছাড়াও আধুনিককালে ভাষাকে জাতিসত্তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়, কখনও প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে। ভাষা তাই মূলত সংস্কৃতি অঙ্গনের হয়েও কখনো কখনো সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, বিশেষত রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রায়ই দেখা যায়, বহুজাতিক-বহুভাষিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর ভাষা কিংবা দুর্বল সংখ্যাগুরুর ভাষা আধিপত্যবাদী ভাষিক মুক্তির নির্যাতন-পীড়নের শিকার। ভাষাকে ঘিরে তাই দ্বন্দ্ব, সংঘাতের উদাহরণ বিশ্বে কম নয় (বহুভাষিক সহিষ্ণু সুইজারল্যান্ড সম্ভবত ব্যতিক্রম)। সেজন্যই বহুভাষিক রাষ্ট্রে ভাষা নিয়ে শক্তিমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার সংঘবদ্ধ বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়। কানাডার মতো দেশেও বিশ শতকের মাঝামাঝি সংখ্যালঘু ফরাসি জনগণ ও তাদের মাতৃভাষা ফরাসির প্রতি ভিন্নভাষী শাসকশ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ফরাসি প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ করার মতো।

ভাষা নিয়ে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। উনিশ শতকে সূচিত এবং বিশ শতকের শুরুতে অব্যাহত আইরিশদের ভাষিক জাতীয়তার লড়াই এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। সেখানে স্থানিক গ্যালিক ভাষা আইরিশ দেশাত্মবোধক ও স্বাধিকার-চেতনার উৎস হয়ে উঠেছিল। দেশজ ভাষা-সংস্কৃতির টানে ভাষিক জাতীয়তার পথ ধরে শুরু হয় ব্রিটেন থেকে আয়ারল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতার তথা স্বাধীনতার লড়াই। পরে স্বশাসনেও স্থানিক সরকারের চেষ্টা ছিল জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আইরিশ ভাষাকে ইংরেজির সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ইংরেজির ভাষিক উপনিবেশবাদী শক্তির দাপটে একমাত্র সরকারি স্কুল ছাড়া অন্যত্র তা সম্ভব হয়নি।

ভাষা এভাবেই বিশ্ব পরিসরে রাজনৈতিক মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা। তিরিশের দশক শেষে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর ফ্যাসিস্ট

একনায়ক ফ্রাংকোর শাসনামলে বাস্কভাষীদের প্রকাশ্য স্থানে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অধিকার নিয়ে ক্রমশ বাস্ক-জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে যা পরে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনে পরিণত হয়। সে আন্দোলন এখন স্বাধীন বাস্ক রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে চরমপন্থি চরিত্র অর্জন করেছে। স্পেনের জন্য ওই বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন এক রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে ভাষার অধিকার নিয়ে লড়াই একাধিক রাষ্ট্রে মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটিয়েছে। আফ্রিকার উপনিবেশভুক্ত কোনো কোনো দেশে স্থানিক ভাষা ও সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রেরণা হয়ে উঠতে দেখা গেছে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সিংহলে সিংহলি ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ এবং তামিল ভাষার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সেখানকার তামিলভাষীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়, যা দমন করতে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। বর্তমান শ্রীলঙ্কায় তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী লড়াই সেই ভাষিক লড়াইয়েরই জাতীয়তাবাদী রূপ, যা শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক স্থিরতা নষ্ট করে চলেছে।

সিংহল (শ্রীলঙ্কা) বা ব্রহ্মদেশই (মিয়ানমার) নয়, ভাষা নিয়ে ও ভাষিক জাতীয়তা নিয়ে আন্দোলন এবং লড়াই বহুজাতিক-বহুভাষিক ভারতীয় উপমহাদেশে সম্ভবত সর্বাধিক দৃষ্ট ঘটনা। বর্তমান ভারতেও আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতি ও সেই সূত্রে জাতীয়তার অধিকার নিয়ে আন্দোলন কোনো কোনো রাজ্যে লড়াইয়ের চরিত্র নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিভাগোত্তরকালে সেখানে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তও উত্তাপ প্রশমিত করতে পারেনি। বরং তামিলনাড়ু, আসাম, অন্ধ্র ইত্যাদি একাধিক রাজ্যে বার্ষিক জাতীয়তার বিকাশ সামাজিক শক্তি ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে এবং সেই সূত্রে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক শক্তির দৃঢ়তাভিত্তিক প্রকাশ ঘটিয়েছে। এদিক থেকে বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গকে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা চলে।

কিন্তু বাংলাভাষী পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) তথা বাংলাদেশ মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই আন্দোলনে শামিল হয়েছে, শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নেমেছে। এর মূল কারণ গোটা পাকিস্তানে জনসংখ্যার হিসাবে বাংলাভাষী মানুষ (বাঙালি) গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা শাসকশ্রেণির অবজ্ঞা, অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়েছে। শাসকশ্রেণির ভাষা উর্দু (যদিও পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের স্থানিক ভাষা তথা মাতৃভাষা নয়) একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিসহ সিন্ধি, বালুচ ও পশতুভাষী পাকিস্তানিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।

এ চেষ্টা ছিল পাঞ্জাবি-প্রধান এবং ভারত থেকে দেশ বিভাগের সময় আগত উর্দুভাষী শাসকশ্রেণি (ভূস্বামী, আমলা, টেকনোক্রাট ও পাঞ্জাবি সামরিক আমলাশ্রেণির) অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সামরিক দিক থেকে গোটা পাকিস্তানে ছিল পাঞ্জাবি-প্রাধান্য। আর নানা কারণে পাঞ্জাবি মধ্য ও উচ্চ শ্রেণিতে উর্দু ছিল ব্যবহারিক ভাষা। সাতচল্লিশ সালের পর থেকেই ভাষাদ্বন্দ্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে ওঠে। এ ভাষাদ্বন্দ্ব যদিও সিন্ধুতে সিন্ধি বনাম উর্দু, সীমান্ত প্রদেশে পশতু বনাম উর্দু হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল, তবু সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে এ দ্বন্দ্বের তীব্র প্রকাশ ঘটে বাংলাভাষী পূর্ববঙ্গে।

এর কারণ পাকিস্তানের প্রাদেশিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির জাতিগত, সংস্কৃতিগত সর্বোপরি ভাষিক ভিন্নতা। ধর্মীয় ঐক্যের জাদু এ ভিন্নতাবোধের অবসান ঘটাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় বিচার্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে স্থানিক ভাষার সচল উপস্থিতি (পাঞ্জাব কিছুটা ব্যতিক্রম) সত্ত্বেও উর্দু সাধারণভাবে বোধগম্য ভাষা, কিন্তু বাংলাদেশে গ্রামবাসী থেকে শহরবাসী, অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিত- অধিকাংশ বাঙালির কাছে উর্দু অপরিচিত বিজাতীয় জবান-এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি যখন একক রাষ্ট্রভাষা উর্দুর মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছে তখন তার প্রতিক্রিয়া বাঙালি-চেতনায় যতটা প্রকাশ পেয়েছিল সিন্ধি-বালুচ-পশতুভাষীদের মধ্যে ততটা দেখা যায়নি। এর অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

ভাষা-সংস্কৃতি-জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানে বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রভেদ ও বৈষম্য এতটাই বস্তুভিত্তিক ছিল যে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের তথা অ্যাকালচারেশনের কোনো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। ওই ত্রি-সূত্রের কারণে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি বাঙালিকে বিজাতীয় (অ্যালিয়েন) জ্ঞান করেছে, যেমন করেছে বাঙালির ভাষাকে। এতটা দূর ও পর মনে করেনি পশতু-বালুচ-সিন্ধিভাষীদের। অবশ্য এক্ষেত্রে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণও ছিল। সে কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা এবং তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপরিচিত ভিন্নতা। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি ভাষার মাধ্যমেই পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক বিজয়ের সূচনা ঘটাতে চেয়েছিল।

তাই বাঙালির পক্ষেও ভাষার অধিকার রক্ষার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পথ তৈরি হয়, ভাষা-চেতনার পথ ধরে রাজনৈতিক অধিকার-চেতনার প্রকাশ ঘটে। সে অধিকার ছিল যেমন ভাষাকেন্দ্রিক তেমনি জাতিসত্তা ও ভূখণ্ডভিত্তিক। পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক দূরত্বও সম্ভবত পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির হিসাব-নিকাশের মধ্যে ছিল। কারণ ভাষা-জাতিসত্তা-সংস্কৃতিগত দূরত্বের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্বের সংযোজন রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, বিচ্ছিন্নতার প্রেরণা জোগাতে পারে। এমন ধারণাই বরাবর পোষণ করেছে পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী। আর সে জন্যই উর্দু রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের মাধ্যমে ও অন্যবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবাঙালি শাসকশ্রেণি পূর্ববঙ্গকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছেন আর্থসামাজিক শোষণের সাহায্যে। বাংলা ও বাঙালির প্রতি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি সচেতনভাবেই গ্রহণ করা হয়। বিষয়টা এতই প্রকট ছিল যে, বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণির তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

বাংলা-বাঙালির বিরুদ্ধে উর্দু তথা পাকিস্তানি উচ্চম্মন্যতা নানা ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- রাষ্ট্র পরিচালনায় তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে; তেমনি জাতি ও সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে। এই ভিন্নতাবোধ ও অযৌক্তিক উচ্চম্মন্যতা ভারত থেকে আসা পূর্ববঙ্গের অবাঙালি বসবাসকারীদের মধ্যেও দেখা গেছে। ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী অতীব সংখ্যালঘু অবাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির সমন্বয় বা অ্যাকালচারেশন সম্ভব হয়নি। ওরা সরকারি প্রসাদপুষ্ট হয়ে ঢাকার মধ্যেই নিজস্ব আবাসভূমি (মোহাম্মদপুরে) চিহ্নিত করে নেয় যা পরিচিত হয়ে ওঠে 'বিহারিস্তান' হিসেবে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তারা গ্রহণ করেনি, পূর্ববঙ্গে বসবাস করেছে বিজাতীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে।

কাজেই তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের নিজস্ব ভাষা উর্দুর প্রতি সমর্থন জোগানো এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির বিরোধিতা করা। ফলে বাঙালি-অবাঙালির দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চাকায় বাঁধা পড়ে ক্রমে বিদ্বেষ ও বিরূপতায় পরিণত হয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে উভয় পক্ষেই ওই বিরূপতা প্রচণ্ড সংঘাতের রূপ নিয়েছে, ঘৃণা ও হিংসার প্রকাশ ঘটিয়েছে। রক্তে রঞ্জিত হয়েছে উভয়েরই হাত।

লেখক : ভাষাসৈনিক, কবি ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমি চত্বরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

ভাষা আন্দালনের উন্মেষ পর্ব

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদেয় মহান ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ইতিহাসসিদ্ধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ যার উন্মেষকাল, পুরো একাত্তর বছর হলো মাতৃভাষা আন্দোলনের বয়স। এই একাত্তর বছরে ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে শত শত গ্রন্থাদি রচনা করা হয়েছে। লেখা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রন্থ, কবিতা, নাটক, ছড়া , চলচ্চিত্র, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই। বাংলা ভাষার এসব সৃষ্টি এখন ঐতিহাসিক সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত বই তথা উন্মেষ কিংবা সূচনাপর্বের সঠিক তথ্য সংবলিত বই আদৌ রচিত হয়নি। যা লেখা হয়েছে তা একতরফা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যেমন বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি সেই সাতচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে অর্থাৎ ভাষার প্রশ্নে সমগ্র বাঙালি ছিল ঐক্যবদ্ধ। মাতৃভাষা তথা মায়ের জবান কেড়ে নেবার প্রতিবাদে বাঙালি সেই প্রথম জেগে উঠেছিল। প্রতিবাদের মূল সূচনা সম্পন্ন করেছিল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তমুদ্দুন মজলিস (নাগরিক বৈঠক) এবং এর স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন তমুদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগের (মুসলিম ছাত্রলীগ) আহ্বানে তরুণ নেতা শেখ মুজিব। তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন খালেক নেওয়াজ, এমএ ওয়াদুদ, বখতিয়ার, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত মিয়া, তাজউদ্দিন, তোয়াহা, শামসুল হক প্রমুখ। ঢাকার এ আন্দোলন রাজধানীর বাইরে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। মূলত মহান ভাষা আন্দোলনের পুরোধা বা অগ্রপথিক ছিলেন ভাষাসৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম। যার চিন্তা ও চেতনায় গড়ে উঠেছিল ভাষা আন্দোলনের একমাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তমুদ্দুন মজলিস।

তাই দুঃখ করে বলতে হয়– সত্তর বছর পরেও একুশের অনুষ্ঠানে শুধু বাহান্নর কথা শুনতে হয়। আটচল্লিশের সেই ভাষা আন্দোলনের স্ফূরণ পর্বের সকল ইতিহাস চেপে যাওয়া হয়। হীন স্বার্থে ভুলে যাওয়া হয় প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও বঙ্গবন্ধুর নাম এবং তাদের সহকর্মীদের অবদান। ইদানীং অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতায় সগৌরবে তমুদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগের অবদানের কথা বলেন এবং স্বীকার করেন। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে এসব বিষয়ের সঠিক বিবরণ রয়েছে। *ভাষা আন্দোলন কোষ* গ্রন্থে তমুদ্দুন মজলিসের কথা থাকলেও বাংলা একাডেমি থেকে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রকাশিত জনৈক ড. সিদ্দিকীর *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন* গ্রন্থটিতে ছাত্রলীগ ও বঙ্গবন্ধুর বিষয়টি সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন বাদ দিয়েছেন *ভাষার লড়াই* গ্রন্থে বদরুদ্দিন ওমর এবং তথাকথিত প্রগতিশীল নামধারী সংগঠনের লেখকবৃন্দ। কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। সে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় আপন বৈভবে। ঈর্ষান্বিত এবং হীন স্বার্থে রচিত তথ্যগুলো আঁধারে হারিয়ে যায়। সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস মানুষের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল। আর ভাষা আন্দোলন তো আমার স্বাধীনতার উৎস।

মহান ভাষা আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি যারা হিংসুটে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেছে এবং তাদের জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সতেরো শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি আবদুল হাকিম। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বিপ উপজেলায়। মাতৃভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে তার কবিতাটি শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। দুটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

যে সবে বন্দেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥

উপমহাদেশ বিভক্তি হবে–ব্রিটিশ সরকারের এমন ঘোষণা শুনে মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৭ মে ১৯৪৭ সালে হায়দারাবাদে বলেন, উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে। এই মসুলিম লীগ নেতার বিরুদ্ধে কলকাতায় সাতচল্লিশের জুন মাসেই ইত্তেহাদ পত্রিকায় আবদুল হকের 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। এর একমাস পরেই আবার আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন মন্তব্য করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। মন্তব্য প্রকাশের পর পরই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদে দৈনিক আজাদে 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। সেটি ছাপা হয় সাতচল্লিশের ২৯ জুলাই এবং একমাস পরই '৪৭-এর ১৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার দাবি সংবলিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'। তমুদ্দুন মজলিসের অফিস, ১৯ আজিমপুর থেকে প্রকাশিত। পুস্তিকাটির প্রথমেই তাঁর প্রস্তাবনা এবং তিনটি প্রবন্ধ স্থান পায়। তিনি ছাড়া অন্য দুজন প্রবন্ধকার হলেন – কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

ঠিক এই সময়ে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর

প্রতিবাদী প্রবন্ধটি তাদের রেনেসাঁ প্রকাশনী থেকে লিফলেট আকারে ছাপা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে তকীউল্লাহ জানান– ঐ লিফলেটটি সেকালে মানুষের হাতে হাতে ও দ্বারে দ্বারে বিলি বন্টনের দায়িত্ব পালন করেন তখনকার ছাত্র ও যুবনেতা শেখ মুজিবুর ও তার সহচরেরা। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্বের শুরু।

১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে পাকিস্তানের শিক্ষা সম্মেলনে আবার উর্দুর পক্ষে সুপারিশ করা হলে ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষোভ করেন। আর অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন তমুদ্দুন মজলিস ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করে। তাঁর সভাপতিত্বে ঢাবিতে সভা হয়। ছাত্রদের এই সভায় ড. মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এস আহমদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, তমুদ্দুন মজলিস অনেক আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মজলিসের গঠনতন্ত্র রচনার প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২৭ মার্চ তৎকালীন ছাত্রনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের এসএম হলের একটি কক্ষে। অক্টোবর মাসে ভাষা আন্দোলন আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাবির ফজলুল হক হলে সাহিত্যসভার পর সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মজলিসের অন্যতম প্রধান কর্মী অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। এতে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিদের যাত্রাকালে অধ্যাপক আবুল কাশেম ও ছাত্রলীগের ছেলেরা একত্রে প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে ভাষার দাবি স্মরণ করিয়ে দেন।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন বসে। কুমিল্লার বাঙালি প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সংশোধনী প্রস্তাব করলে মুসলিম লীগারদের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়ে যায়।

এরপর উন্মেষপর্বের ভাষা আন্দোলন ঢাকা, বরিশাল, নওগাঁ, রাজশাহী, খুলনা, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, দিনাজপুরসহ দেশের সর্বত্র শুরু হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা। অধিকাংশ স্থানে কর্মসূচির আয়োজন করে ছাত্রলীগ। রেল শ্রমিক লীগের সদস্যরাও এতে অংশ নেন এবং অধ্যাপক আবুল কাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে গণ আজাদী লীগ, এসএম হল, ফজলুল হক হল এবং *ইনসাফ*, *জিন্দেগী* ও *দেশের দাবী* পত্রিকার পক্ষ থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সম্প্রসারিত করা হয় এবং ২৭ মার্চ-১৯৪৮ সালের সভায় সিদ্ধান্ত হয় ভাষার দাবিতে ৭ মার্চ ঢাকা এবং ১১ মার্চ দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালন করা হবে।

তমুদ্দুন মজলিসের আরো দুটি উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড ছিল মজলিসের খবরাখবর প্রকাশ ও ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর সাপ্তাহিক মুখপত্র *সৈনিক* প্রকাশ। এর মূল সম্পাদক প্রখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী ও মুদ্রক অধ্যাপক আবদুল গফুর। এই পর্বে ঢাকার আবদুল ওয়াহেদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক ইনসাফও বিশেষ সমর্থন জানায়। কলকাতার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক *ইত্তেহাদ* আগে থেকেই পক্ষে ছিল। যার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।

এক পর্যায়ে তমুদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনের পক্ষে স্মারকপত্রের জন্য ঢাকার অলিতে গলিতে স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেন। কয়েক হাজার সই সংগ্রহ করেন। মন্ত্রী ও পুলিশের লোকেরাও এতে স্বাক্ষর করে সমর্থন জানান। আর মুসলিম লীগ গোড়া থেকেই ছিল বাংলাভাষা তথা বাঙালি সংস্কৃতির ঘোরতর শত্রু। ১৯৪৯ সালে তমুদ্দুন মজলিস আবার প্রকাশ করে 'একমাত্র পথ' শীর্ষক একটি পুস্তিকা এবং আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনবার সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে। প্রতিনিয়ত বৈঠক করে আন্দোলনকে বেগবান করেন মজলিসের লোকেরা।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, ৭ মার্চ ঢাকায় এবং ১১ মার্চ দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালনের কথা। ১১ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের দৃশ্যপটটি আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়লেই জানতে পারি। তিনি লিখেছেন:

ফেব্রুয়ারি ৮ই হবে, ১৯৪৮ সাল। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়ও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না । আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমুদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম । এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমুদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু শাখা জেলায় ও মহকুমায় করা হয়েছে। তমুদ্দুন মজলিস একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেব। এদিকে পুরানা লীগ কর্মীদের পক্ষ থেকে জনাব কামরুদ্দিন সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও অনেকে সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করলেন। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থক ছাত্ররা আমার সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করলে খুব মারপিট হয়, কয়েকজন জখমও হয়। এরা সভা ভাঙতে পারে নাই, আমি শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। এ সময় জনাব আবদুস সবুর খান আমাদের সমর্থন করছিলেন। বরিশালের জনাব মহিউদ্দিন আহমদ তখন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য, মুসলিম লীগ ও সরকার পুরা সমর্থন। কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ আমাদের দলের নেতা ছিলেন। আমি কলেজেই সভা করেছিলাম। মহিউদ্দিন সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ঢাকায় ফিরে এলাম। রাতে কাজ ভাগ হল– কে কোথায় থাকব এবং কে কোথায় পিকেটিং করার ভার নেব। সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল। জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড, মেডিকেল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশেষ করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। মুসলিম লীগ ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিল আমাদের উপর। অধিকাংশ লোককে আমাদের বিরুদ্ধে করে ফেলল। পুরান ঢাকার কয়েক জায়গায় ছাত্রদের মারপিটও করল। আর আমরা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাই এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করল।

১১ই মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার হয় নাই। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে ফেলা হলো। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল। কিছু খোলাও ছিল। পুরান ঢাকা শহরে পুরাপুরি হরতাল

পালন করে নাই। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের উপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হল। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেক দল হাজির হতে লাগল। ফজলুল হক হলে আমাদের রিজার্ভ কর্মী ছিল। এইভাবে গোলমাল, মারপিট চলল অনেকক্ষণ। নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হল। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার (এখন নওগাঁর এডভোকেট), শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. ওয়াদুদ গুরুতররূপে আহত হল। তোপখানা রোডের কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত মিয়া আরও অনেক ছাত্র আহত হল। আবদুল গনি রোডের দরজায় তখন আর ছাত্ররা অত্যাচার ও লাঠির আঘাত সহ্য করতে পারছে না। অনেক কর্মী আহত হয়ে গেছে এবং সরে পড়ছে। আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটেছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে গ্রেফতার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বার বার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না। এবার দেখলাম উপায় নাই। একজন সহকর্মী দাঁড়ানো ছিল তার কাছে সাইকেল দিয়ে চার-পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় আমরা বসে পড়লাম এবং সাইকেল যাকে দিলাম তাকে বললাম, শীঘ্রই আরো কিছু ছাত্র পাঠাতে। আমরা খুব অল্প, টিকতে পারবো না। আমাদের দেখাদেখি আরও কিছু ছাত্র ছুটে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল। আমাদের উপর কিছু উত্তম-মাধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল। হক সাহেবকে পূর্বেই জিপে তুলে ফেলেছে। বহু ছাত্র গ্রেফতার ও জখম হল। কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। অলি আহাদও গ্রেফতার হয়ে গেছে। তাজউদ্দীন, তোয়াহা ও অনেককে গ্রেফতার করতে পারে নাই। আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।

তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। শোভাযাত্রা রোজই বের হচ্ছিল। নাজিমুদ্দিন সাহেব বেগতিক দেখলেন। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ওয়াদুদ ও বখতিয়ার দু'জনই ছাত্রলীগ কর্মী, তাদের ভীষণভাবে আহত করে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এই সময় শেরে বাংলা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ড. মালেক, সবুর সাহেব, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন ও আরও অনেকে মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিবাদ করলেন। আবার শহীদ সাহেবের দল এক হয়ে গেছে। নাজিমুদ্দিন সাহেব ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলাপ করতে রাজি হলেন। আমরা জেলে, কি আলাপ হয়েছিল জানি না। তবে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন সাহেব জেলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বললেন, নাজিমুদ্দীন সাহেব এই দাবিগুলি মানতে রাজি হয়েছেন: এখনই পূর্ব পাকিস্তানের অফিসিয়াল ভাষা বাংলা করে ফেলবে। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা থেকে সুপারিশ করবেন, যাতে কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়। সমস্ত মামলা উঠিয়ে নিবেন, বন্দিদের মুক্তি দিবেন এবং পুলিশ যে জুলুম করেছে সেই জন্য তিনি নিজেই তদন্ত করবেন। আর কি কি ছিল আমার মনে নাই। তিনি নিজেই হোম মিনিস্টার, আবার নিজেই তদন্ত করবেন– এ যেন এক প্রহসন।

আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই,' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'– নানা ধরনের শ্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে বললাম, হক সাহেব ঐ দেখুন বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না। হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'

আমাদের ১১ তারিখে জেলে নেওয়া হয়েছিল, আর ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়। জেলগেট থেকে শোভাযাত্রা করে আমাদের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নিয়ে যাওয়া হল।

আটচল্লিশের ১১ মার্চের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন শিক্ষা ও শক্তি পেয়েছিল ১১ মার্চের আন্দোলন থেকে। ১১ মার্চের আন্দোলনের ফলে নাজিমুদ্দীন সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তা কার্যকর হয়নি। তাই '৫২-র একুশের আত্মাহুতি। প্রথম পর্বে কেবলমাত্র তমুদ্দুন মজলিস, মুসলিম ছাত্র লীগ (ছাত্রলীগ), ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং পূর্ব বাংলার ভাষাপ্রেমী বাঙালি জনগণেরই অপরিসীম অবদান। আর এই অবদানের কথা পাকি মনোভাবের বাঙালি সরকার করতে চান না। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনেও তমুদ্দুন মজলিসের সদস্য তথা নেতৃবর্গই নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু জেলে থেকে তা পরিচালনা করেছেন। বসেছিলেন না প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমও।

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা পায়। পাশাপাশি ২ বছর পরে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ফ্রন্টের বিজয় ঘটে। প্রদেশে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। যুক্তফ্রন্টের অংশীদার ছিল অন্যান্য দলের মতো খেলাফতে রব্বানী পার্টি। আর এই রব্বানী পার্টি ছিল তমুদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্লাটফর্ম। ঐ নির্বাচনে অধ্যাপক আবুল কাশেম চট্টগ্রাম আর কথাশিল্পী শাহেদ আলী সিলেট থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সখ্য গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী লোকজনদের সাথে। অধ্যক্ষ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন তমুদ্দুন মজলিসের সক্রিয় পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। তমুদ্দুন মজলিসের নেতৃবর্গ ছিলেন মুসলিম লীগবিরোধী জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের প্রথম সংগঠন তথা মাতৃভাষা আন্দোলনের একমাত্র ইনস্টিটিউশন। মজলিসের সংশোধিত তৃতীয় গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছিল: আদর্শের ভিত্তিতেই সমস্যা জর্জরিত এবং নিপীড়িত বিশ্বমানুষের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব। আর নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির মুক্তি এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১১ মার্চের আন্দোলনে ২০০ জন ভাষাপ্রেমী গুরুতরভাবে আহত হন এবং জেলবন্দি হন ৬৯ জন। বন্দিদের মধ্যে কয়েকজন কিশোরও ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে নামধামও উল্লেখ করেছেন।

ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেও আমরা আজও ঐসব আন্দোলনের বীরদের যথাযথ মূল্যায়ন করি না। যেমন আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভ্রান্ত-বিভ্রাট সৃষ্টি করি। মূলত বাঙালির নবজাগরণে তমুদ্দুন মজলিস, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও বঙ্গবন্ধু চমকে দেওয়া বিপ্লবী নাম। তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। এ আন্দোলনে বাঙালি ভাষাপ্রেমিক অংশগ্রহণকারীদের আমরা চিরকাল স্মরণ করব। তাদের পথ ধরেই আমরা স্বাধীনতা আনতে পেরেছি। ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু–দুজনই বাঙালির প্রাণপুরুষ। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের বাংলা ভাষার প্রতি ছিল অপরিসীম দরদ। এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে ভাষাকেন্দ্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

গণতন্ত্র দরকার, উন্নয়নও প্রয়োজন

ড. মোহাম্মদ হাননান

লেখার শিরোনামটি দেওয়ার পর পল্লিকবি জসিমউদ্‌দীনের লেখা একটি গল্পের কথা মনে পড়ল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবি একবার পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি (পূর্বে এ নামেই দুটো দেশ ছিল, এ তথ্যটি দিলাম বর্তমান এ প্রজন্মের পাঠকদের জন্য) এ দুটো দেশ সফর করে তিনি একটি ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন। গল্পটি তিনি দু'জার্মানিতেই ভিন্ন ভিন্নভাবে শুনেছিলেন–একবার পূর্ব জার্মানির এক কুকুর পশ্চিম জার্মানির সীমান্তে গিয়ে হাজির। সেখানে এল পশ্চিম জার্মানির একটি কুকুর। পশ্চিম জার্মানির কুকুর, পূর্ব জার্মানির কুকুরকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস?' পূর্ব জার্মানির কুকুর উত্তর দিল,'পেট ভরে তো খেতে পারি, কিন্তু ঘেউ ঘেউ একদম করতে পারি না'। এবার পূর্ব জার্মানির কুকুর পালটা প্রশ্ন করল পশ্চিম জার্মানির কুকুরকে। বলল, 'আর তুই কেমন আছিস! পশ্চিম জার্মানির কুকুরের উত্তর, 'ঘেউ ঘেউ করতে পারি খুব, কিন্তু পেটে ভাত নেই'। গল্পটা অনেকটা এরকমই ছিল, হুবহু নয়, স্মৃতি থেকে লিখলাম। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি দুটো দেশ, দুটো আলাদা আদর্শেরও ছিল। পূর্ব জার্মানি ছিল সোভিয়েত ব্লকের সমাজতন্ত্রী, পশ্চিম জার্মানি ছিল আমেরিকান ব্লকের গণতন্ত্রী। আজ দু'জার্মানি আবার একত্রিত হয়েছে, জনগণের দুটোই চাই, বাক স্বাধীনতা এবং পেটে ভাত। একটা ছাড়া অন্যটা যেন অচল। কিন্তু চিন্তা করতে হবে, কোনটা আগে!

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। কেন এমন কথা বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। আমরা হয়ত ভুলে গেছি, সেদিন আমাদের কিছুই ছিল না। রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট যা ছিল তাও সব পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল। এমনকি তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক)-এর সব টাকায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। সবদিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছিল। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দেশে গোলযোগ লাগানোর অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিল স্বাধীনতাবিরোধী ও পরাজিত শক্তি পাকিস্তানিদের এজেন্টরা।

আন্তর্জাতিক এজেন্টরাও বসেছিল না। বিশ্ব-ব্যাংক তাদের দুই অর্থনীতিবিদকে পাঠালো সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে সাহায্য করার পরিকল্পনা করতে। এ দুই অর্থনীতিবিদ Just Faaland এবং J.R Parkinson তো ঢাকায় এসেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। বললেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন! এমন দেশের আবার উন্নয়ন হয় নাকি! 'যদি এমন দেশের উন্নয়ন হয়, তাহলে দুনিয়ার সব দেশই উন্নত হবে'। 'যদি বাংলাদেশের উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত হয়-ই, তাহলেও দু'শত বছর সময় লাগবে'। আরো বললেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন হলো পৃথিবীর কঠিনতম এক সমস্যা'। শেষ পর্যন্ত তারা একটি রিপোর্ট লিখলেন, রিপোর্টটির নাম দিলেন *Bangladesh : The Test case of development.* পাঠক দেখতে পারেন, ঢাকার প্রকাশনা সংস্থা ইউ.পি.এল থেকে ১৯৭৬ সালে রিপোর্টটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই লেখাটি বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের জন্য, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশের হাল ধরবে। তাদের জানতে হবে কোথা থেকে উঠে এসেছি আমরা। আমাদের নিয়ে কত রকম উপহাস, ঠাট্টা ও টিপ্পনী কাটা হয়েছে সেদিন। আজও কি এর শেষ হয়েছে! এই তো দু'বছর আগেও পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের কী তুমুল বাকযুদ্ধই না হয়ে গেল। পদ্মা সেতুর কাজ শুরুই হয়নি, টেন্ডারও হয়নি, বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত টাকাও দেয়নি, এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল অভিযোগ, পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়ে গেছে! বিশ্বব্যাংকের যেন মুখপাত্র হয়ে উঠল আমাদের গণমাধ্যম। প্রতিদিন বড়ো বড়ো শিরোনাম। রাজনৈতিক দলগুলো ও খুব খুশি, একটা বড়ো 'কেস' ধরা পড়েছে! একজন যোগ্য মন্ত্রী বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো, বিশ্বব্যাংকের এ অভিযোগ ছিল মিথ্যা। বিশ্বব্যাংকের যে কর্তা এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাফালাফি করেছিলেন, তিনি নিজেই এখন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তে-বন্দি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আত্মপ্রত্যয়ী জাতির প্রতিনিধি হয়ে মাথা নোয়ালেন না। তিনি নিজেদের টাকাতেই এত বড়ো এক প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখালেন। এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে জাতির সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনা যখন প্রায় একাই বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তখন আমরা কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারিনি। যে রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখেছি, বিশ্বব্যাংক আর সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিত, সে দলগুলো বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামে শামিল হতে ব্যর্থ হলো। রাজনীতি কি শুধু 'ঘেউ ঘেউ' করার স্বাধীনতা! রাজনীতি কি কখনো এদেশে গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসতে পারবে না! শুধু শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ কাজগুলো করছে বলে আমরা এর থেকে দূরে থাকব! আমরা কি পারতাম না তাঁর নানা সমালোচনার পাশাপাশি তাঁর ভালো কাজগুলোকে প্রশংসা করতে! সুশীল সমাজ খ্যাত পরিবারের সদস্যদের লেখা কোনো কলামে আমি এ পর্যন্ত এ সরকারের সমালোচনা ব্যতীত কোনো কাজেরই প্রশংসা করে কোনো লেখা দেখিনি। তাহলে কি এ সরকার ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কিছুই করেনি! কোনো উন্নয়নই তাদের চোখে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি, যা নিয়ে তারা লিখতে পারতেন!

আমি এ সরকারের দশটি অর্থনৈতিক মেগা প্রকল্পের কথা বলছি, দেখুন এ নিয়ে কিছু লেখা যেত কি-না:

১. পদ্মা সেতু প্রকল্প ২. পদ্মা রেলওয়ে সেতু প্রকল্প ৩. রূপপুর

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ–ফাইল ফটো

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৪. রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প ৫. মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৬. মেট্রোরেল প্রকল্প ৭. সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প ৮. পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প ৯. দোহাজারি-কক্সবাজার-ঘুনদুম রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প ১০. এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প।

উপরিউক্ত দশটি প্রকল্পের মধ্যে শুধু রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়েই আমরা কয়েক হাজার নিবন্ধ, বিবৃতি, মিছিল দেখেছি। সেটা রাজনীতিক-এনজিওরা করতেই পারেন। কিন্তু বাকি নয়টি প্রকল্প সম্পর্কে তো তাদের কোনো বক্তব্য শুনলাম না। যদি সেগুলোতে সমালোচনার কিছু না থাকে, তাহলে তো আমরা সেগুলোর একটু হলেও প্রশংসা করতে পারতাম, নাকি পারতাম না? আমাদের রাজনীতি কি ঐ নেতিবাচকতাতেই ঘুরপাক খেতে থাকবে! এ প্রবণতায় কার লাভ হচ্ছে, সুশীল সমাজের কাছে আমরা এর একটা জবাব চাই। তবে রাজনীতিবিদরা তাদের বিরোধী কোনো সরকারের প্রশংসা করতে সাহস না পেলেও, অর্থনীতিবিদরা কিন্তু প্রশংসা করতে পেরেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদদের অনেক কথা আছে, কিন্তু সরকারের অর্জন সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। প্রফেসর রেহমান সোবহানের কথা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করব। আজকের প্রজন্মের অনেকেই জানেন না, রেহমান সোবহান পাকিস্তান আমলে ১৯৬০-এর দশকে 'দুই অর্থনীতি তত্ত্বের জনক'। বঙ্গবন্ধু ৬-দফা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁদের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই। সেই রেহমান সোবহান সরকারের কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করলেও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভালো করেছি। হেনরি কিসিঞ্জার (সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।) যে বলেছিলেন, আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি হব, সেই ভাবমূর্তি আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কথিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের অর্থনীতি অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভালো করেছে। দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আট বছরের বেশি সময় ধরে বিরোধী দলের কার্যকর বিরোধিতা ছাড়াই ক্ষমতায় আছে। শক্তিশালী এক নেতা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি সমস্যাগুলো ভালোভাবেই বোঝেন, আর কীভাবে তা সামাল দিতে হয়, তাও জানেন। এছাড়া বর্তমান নেতৃত্বের জমানায় অর্থনীতি ভালো করেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান। আর নিজেদের সম্পদে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তও প্রশংসিত হয়েছে।...

যে দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য আছে, যারা সব সময় প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসায় বিশ্বাসী, তাদের এমন নির্বাচনি বিজয় অর্জন করতে হবে, যার গ্রহণযোগ্যতা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

[পাঠক বিস্তারিত দেখতে পারেন, রেহমান সোবহানের সাক্ষাৎকার, প্রথম আলো, ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১০]

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের এ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমাদের রাজনীতিক এবং সুশীল সমাজের জন্য এটি একটি বার্তাও। সরকারের সমালোচনা করা সহজ কিন্তু ভালো কাজের জন্য সরকারের প্রশংসা করা কঠিন। কিন্তু অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান তা করে দেখিয়েছেন। আর এটা না করা এখন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো একটা উদাহরণ দেই। যখন কোনো নির্বাচন হয় তখন যেখানে বিরোধী দলের প্রার্থী জয়লাভ করে তখন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ মনে করে নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হয়েছে। কিন্তু সরকার-দলীয় প্রার্থী জিতলেই সন্দেহ আমাদের ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এটা কেন? নির্বাচনে কি সরকার-দলীয় প্রার্থী জিততে পারে না! আর যদি সরকার-দলীয় প্রার্থী জেতে তাহলে তাকে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা হলো না।

দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখন দৃশ্যমান। আমি দশটি উন্নয়ন কর্মসূচির নাম বলছি, যা একান্তভাবে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব সৃজনশীল চিন্তাশীলতা থেকে উৎসারিত:

১. **একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প:** প্রকল্পটি ২০১৬ সাল থেকে 'পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক' নামে যাত্রা শুরু করেছে। এ ব্যাংকের ৪৯% অংশের মালিক এক সময়ের দেশের একেবারে অবহেলিত নারী-পুরুষ। এর আওতায় ৪০ হাজারেরও বেশি 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' গড়ে উঠেছে। সমিতির উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ২১ লাখের বেশি, আর প্রত্যক্ষ উপকারভোগী দেড় কোটির কাছাকাছি।

২. **ছিন্নমূল মানুষদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'গুচ্ছগ্রাম'-এর অনুকরণে গড়ে উঠেছে এ প্রকল্প। প্রধানভাবে ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের সাহায্যের জন্য এই প্রকল্প। একটি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয়, হতদরিদ্র মানুষের ন্যায্য অধিকার। জমি আছে ঘর নেই এ রকম হাজারো মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে এ প্রকল্প। ১৯৯৭ থেকে শুরু হয়েছিল এর কাজ, এখন পর্যন্ত দুই লাখেরও বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে।

৩. **ডিজিটাল বাংলাদেশ:** এ এক নতুন বাংলা । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের 'সোনার বাংলা'র পরিপূরক। জনগণের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অনলাইন সেবা। ফলে দুর্নীতি, ভোগান্তি শব্দগুলো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। পাঁচ হাজারেরও বেশি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে ১৪ কোটি মানুষই এখন মোবাইল ফোনের গ্রাহক, আর ইন্টারনেটের গ্রাহক ৮ কোটিরও বেশি। ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু হয়ে গেছে দেশে। ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রকল্প' চালু রয়েছে এই বাংলাদেশে।

৪. **শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি:** বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন এ দেশের সাক্ষরতা হার ছিল ১৭%। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন একেবারে তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে। একরকম বিধ্বস্ত অর্থনীতির মধ্যেই স্বাধীন দেশে তিনি প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে ফেললেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এর ধারাবাহিকতায় তৈরি করেছেন 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি'। শতভাগ শিশুই যেন স্কুলে আসতে পারে, এসেই যেন তারা বিনামূল্যে বই পায়, মেয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে এর সঙ্গে বিনা বেতনেই পড়তে পারে এ লক্ষ্যে এ কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। দেশে এখন শিক্ষার হার গত ৯ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে ১৫৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন এখন যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কোথায় চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ, বুঝতে যেন একটু দেরিই হয়ে গেল আমাদের।

৫. **নারীর ক্ষমতায়ন:** নারীরা কৃষিতেও আছে-আগে এমন একটা কথা নারী উন্নয়ন কর্মীরা বলত। এখন তো লিখতে হচ্ছে, পর্বত-শৃঙ্গেও বাংলাদেশের নারী দাঁড়িয়ে আছে লাল-সবুজ পতাকা হাতে করে। নারী জনশক্তিনির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।

৬. **ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ:** ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করেন। বর্তমানে দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জুন ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মোনাজাত করেন–পিআইডি

[সূত্র: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০১৭]। ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্‌বোধনকালে এক ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি যখন প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন ৩,৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলেন। এখন এটা ১৬ হাজার মেগাওয়াট হয়েছে। তিনি এসময় আরো বলেন, দেশের ৮৩ শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য-প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। শতভাগ বিদ্যুতায়িত ১০টি উপজেলার সঙ্গে নতুন করে সেদিন যুক্ত হয়েছে আরো ৩৬টি উপজেলা। বিগত বছরগুলোতে ১ কোটিরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের মধ্যে নতুন করে এসেছে। আর সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আরো ২ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় বলছে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৩৭১ কিলোওয়াট ঘণ্টা, আর বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তবে গ্রামের কৃষকের আগ্রহ অন্যত্র। তাদের চাহিদা মেটাতে সেচকাজে বিদ্যুৎ সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬২ লক্ষতে উন্নীত হয়েছে।

৭. **কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য:** এ বিষয়টি পুরোটিই গ্রামীণ নারীকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রামের মা-বোনরা চিরজীবনই ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। একটা পুরো সংসার আগলে রাখে গ্রামের নারী। তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যটিকে প্রাধান্য দিলেন শেখ হাসিনা, কারণ তিনি একজন নারী। গ্রামের নারীর দুঃখ-বেদনা অন্য যে-কারোর চেয়ে তিনি যে বেশি বুঝবেন, তার ইতিহাসটি সকলেরই জানা। শেখ হাসিনা বড়ো হয়েছেন গ্রামের প্রতিবেশেই। তাই গ্রামের প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক আর সারা দেশে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামের মানুষ। ক্লিনিক থেকে ৩০ প্রকার ঔষধ বিতরণ হচ্ছে বিনামূল্যে।

৮. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:** হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে যেন একটা ছেদ ঘটল। সমাজের অবহেলিত, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২৮টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। ২৫ লক্ষ অসহায় বয়স্ক মানুষ মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা পেতে শুরু করেছেন। ৯ লাখের অধিক বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্ত নারীও পাচ্ছেন ৪০০ টাকা করে ভাতা। ১ লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে। যখন খেটে খাওয়া মানুষের কাজ থাকবে না, তখন তাদের জন্য হাজির হবে ৪০ দিনের কর্মসূচি। বিষয়গুলো হয়ত টাকার অঙ্কে ততটা বড়ো নয়, কিন্তু মানবিকতার বিবেচনায় এর মূল্য অসীম। এটা তো শুরু মাত্র, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে সবই।

৯. **বিনিয়োগ বিকাশ:** বাংলাদেশের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন অধিক অধিক বিনিয়োগ। ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো বিদেশি বিনিয়োগ ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে আর ২০১৭ সালে তা ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর একটা শুভ প্রভাব পড়বে দেশের আর্থসামাজিক খাতে।

১০. **পরিবেশ সুরক্ষা:** একটি ঊর্ধ্বগামী দেশের জন্য এ কর্মসূচি ছিল অপেক্ষিত। বাংলাদেশে এখন বনভূমির বিস্তার ঘটছে। সর্বত্র পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে। নির্মল বায়ু প্রকল্প, বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট, জীববৈচিত্র্য আইন ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও তাই এসেছে স্বীকৃতি।

অনেক সময় আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর দেশের একটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয় যে, 'তথ্যপ্রযুক্তিতে এখনো পিছিয়ে বাংলাদেশ'। চমকে উঠি। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন সূচক ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংবাদটি করা হয়েছে। সংবাদটির ভেতরে ঢুকি, দেখে অবাক হই, বাংলাদেশের প্রতি ১০০ জনে মাত্র ১৮ জনের হাতে মোবাইল নেই, আর সকলের হাতে আছে। এটা গত বছরের পরিসংখ্যান, এ বছরের প্রতিবেদনে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে, প্রতি ৭৮ জনের হাতেই আছে। কেন কমল দেখি, রিপোর্টেই উল্লিখিত হয়েছে, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম পুনর্নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কারণে মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে। স্বস্তি পেলাম। এ বায়োমেট্রিকের জন্য কত অবৈধ মোবাইল ব্যবহারকারী কমে গেছে, আর এটাই তো হয়েছে একটা অর্জন।

এই সময়ে বড়ো অর্জনগুলোর মধ্যে একটি হলো, পরমাণু যুগে বাংলাদেশের প্রবেশ। আমরা যখন শিশু-কিশোর তখন থেকেই শুনে আসছি রূপপুরে পরমাণু প্রকল্প হবে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানিরা এ কাজ থেকে সরে গেল। আর বঙ্গবন্ধুকে তো কাজ করতেই দেওয়া হলো না। এরপর কত সরকার আসল-গেল, শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার হাতেই উদ্‌বোধন হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দুনিয়ার শত শত দেশের মধ্যে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে বাংলাদেশ হলো ৩২তম সদস্য। এ গৌরবকে অবশ্যই আমরা উদ্‌যাপন করতে পারি। পাকিস্তানিরা ১৯৬১ সালে হতে দেয়নি। স্বাধীনতার অর্ধশত বছরের কাছাকাছি সময়ে এসে বাংলাদেশ তা অর্জন করে নিল।

বস্তুত এমন সব পয়েন্টের ভিত্তিতেই পাকিস্তানি শাসনের জিঞ্জির ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীনতাকে বরণ করে নিয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহের আজ প্রায় অর্ধশত বছর হতে চলেছে। আজ পাকিস্তানিদের থেকে সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সব সূচকে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। সরকারি-বেসরকারি খাতে বাংলাদেশে যে সমন্বিত উদ্যোগ চলছে তাতেই এ সাফল্য এসেছে বলে গণমাধ্যম মনে করছে। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি এখন পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের চেয়ে পাকিস্তানে বেকার মানুষ বেশি। আবার পাকিস্তানিদের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যুর হার কমাতেও বাংলাদেশ বেশি সাফল্য দেখিয়েছে।

শেখ হাসিনা একটি সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গত নয় বছর ধরে। বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ৩৩.৪ শতাংশ থেকে কমে ২৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রায় এক দশক ধরেই বাংলাদেশ ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। সর্বশেষ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ। অথচ পাকিস্তান গত কয়েক বছরে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। মাথাপিছু আয় অবশ্য বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রায় সমান সমান। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬২৯ ডলার। আসলে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় আরো বেশি হওয়ার কথা ছিল, ১৯৭১ সালে সোনার বাটিটা তাদের কাছেই ছিল, বাঙালিরা শুরু করেছিল এক ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সামনে নিয়ে।

বাংলাদেশের এখন বড়ো শক্তি ছাত্র, তরুণ ও যুবা শক্তি। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ কোটি ৯৫ লাখ নারী-পুরুষ কাজ করে। আর পাকিস্তানে কাজ করে ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ লোক। বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ। মাত্র ২ লাখ ৯০ হাজার লোক বেকার বাংলাদেশে। অন্যদিকে পাকিস্তানে বেকারত্বের হার ৫.৯৯ শতাংশ, প্রায় ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার পাকিস্তানি এখনো বেকার অবস্থায় রয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ প্রায় সব সামাজিক সূচকে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। এর প্রভাবটা আমরা দেখি দু'দেশের গড় আয়ুর পার্থক্যের মধ্যে। বাংলাদেশের মানুষকে আল্লাহতায়ালা তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানিদের তুলনায় বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখছেন। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭১.৬ বছর। বাংলাদেশের নারীদের আয়ুতে আরো বেশি বরকত, ৭২.৯ বছর, আর পুরুষদের গড় আয়ু ৭০.৩ বছর। পাশাপাশি পাকিস্তানের মানুষের গড় আয়ু ৬৭ বছর। পাকিস্তানের মেয়েরা বাঁচে ৬৮.২ বছর, আর পুরুষরা বাঁচে গড়ে ৬৫.৮ বছর । বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন ১.৩৬ শতাংশ, আর পাকিস্তানে এই হার ১.৮৬ শতাংশ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে, আর তাহলো শিক্ষার হার। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের যুদ্ধ হয়, তখন শিক্ষার হার ছিল ১৭%। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ, পাকিস্তানে এই হার মাত্র ৫৮ শতাংশ, বলা চলে অর্ধেক পাকিস্তানি আজও নিরক্ষরই আছে। জিডিপি'র অনুপাতে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে বেশি খরচ করে।

শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, পোলিও নির্মূল ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশের সফলতা অসামান্য। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে এসব ব্যাপারে বাংলাদেশ সততই প্রশংসা, পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এক বছর বয়স হওয়ার আগে প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে বাংলাদেশে মৃত্যু হয় ২৮ শিশুর আর পাকিস্তানে মৃত্যু হয় ৬২ শিশুর। বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে পোলিও নির্মূল করেছে, পাকিস্তানের এ ব্যাপারে সফলতা খুব দুর্বল অবস্থানে। নিচের সারণি এক নজর দেখুন:

তুলনামূলক চিত্র পাকিস্তান-বাংলাদেশ

সূচক	পাকিস্তান	বাংলাদেশ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.২৮%	৭.২৮%
মাথাপিছু আয়	১৬২৯	১৬১০
কর্মজীবী	৫.৭৪ কোটি	৫.৯৫ কোটি
বেকার	৫.৯%	৪.২%
সাক্ষর	৫৮%	৭১%
শিশুমৃত্যু	হাজারে ৬২	হাজারে ২৮
গড় আয়ু	৬৭ বছর	৭১.৬ বছর

সূত্র: সম্প্রতি প্রকাশিত পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬-১৭ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ সারণিটি তৈরি করেছে ঢাকার সংবাদপত্র প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭, বিজয় দিবস সংখ্যায়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায়ও বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, যাকে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন 'অসাধারণ'। [পাঠক এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখতে পারেন, আমর্ত্য সেন: তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০ গ্রন্থখানি]। বাংলাদেশের অগ্রগতি বিষয়ে অমর্ত্য সেনের প্রধান আগ্রহ নারী উন্নয়নে। সরকারি নারী কর্মকর্তারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পান, কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার গ্রামের দরিদ্র মাতার জন্যও মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করেছেন। দেশের ২ লক্ষ ৬৪ হাজার গর্ভবতী গ্রামীণ মা মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা-কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে এসেছেন। এ কর্মসূচি সম্ভবত বিশ্বে এখনো একমাত্র। ভাতার পরিমাণ যেমনই হোক, এ একটা শুরু, সেভাবেই আমাদের আস্থায় নিতে হবে।

কতকগুলো প্রশাসনিক সংস্কার হয়েছে যা এক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক। রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ হয়েছে। আপনি বলতে পারেন, এতে জনগণের কী লাভ হয়েছে? আমি বলব, এটা জনগণেরই বিষয়। জনগণকে দ্রুত প্রশাসনিক সেবা প্রদান করাই লক্ষ্য। ৫৫ জন বরেণ্য ব্যক্তি ও ৪টি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে, কেউ বলতে পারেন, এটা তো একটা সরকারের রুটিন কাজ। কিন্তু অপেক্ষিত ছিল এমন অনেক বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, তা এসেছে এ সরকারের কারণেই। অতীতে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অনেক স্বাধীনতাবিরোধীকেও, এমন একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়নি মুক্তিযুদ্ধপন্থি সরকার ক্ষমতায় থাকাতে, এ শোকরিয়া আমাদের মহান আল্লাহর কাছে করতেই হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে শুদ্ধ আচারের পথে অবিচল থাকে, এখন এর অধীনে এ বিষয়ে নিরন্তর প্রশিক্ষণ চলছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখেছি, রপ্তানি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে ১৮টি দেশে ২১টি বাণিজ্য-উইং কাজ করছে। ৪৪টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তি হবে, এ সময় রপ্তানির পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে গিয়ে পৌঁছবে। বাংলাদেশ এ সময়গুলোতে ১৯৬টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ২,৮০৯,৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ পাবনা জেলার ইশ্বরদীর রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কংক্রিট ঢালাইয়ের শুভসূচনা করেন –পিআইডি

করেছে। বর্তমান সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৫ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১,২০৮,৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা যে সরকার চায় তার প্রমাণ রেখেছে তথ্য কমিশন গঠন করে। আগে এমন সংস্থা বাংলাদেশে ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষক এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান চালু করা হয়েছে এবং এর অধীনে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ৬০৮ জন সাংবাদিক অথবা তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গণমাধ্যমের জন্য এ সরকারের বড়ো আরেকটি অবদান সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন। একটা বড়ো অঙ্কের তহবিল নিয়েই এর যাত্রা শুরু হয়েছে। ৩২টি কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্র এবং ২৪টি এফএম বেতার কেন্দ্রের অনুমোদন এ সরকারের আমলেই হয়েছে। ৩১টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলেরও অনুমতি এ সরকারের আমলেই ঘটেছে। অনলাইন গণমাধ্যমের নিবন্ধন চলছে, শীঘ্রই এ বিষয়েও একটি সুন্দর সিদ্ধান্ত আসবে বলে সকলেই আশাবাদী। ১,৪৯৭টি নতুন সংবাদপত্রের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আবাসিক সুবিধাসহ শত শত সাংবাদিককে উন্নততর সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছে।

অতীতের সরকার এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল বন্ধ করে দিয়েছিল। আর যাতে এটা চালু না হতে পারে তার জন্য যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সকল অবকাঠামোও ভেঙে ফেলে। বর্তমান সরকারের ভূমিকা এর ঠিক বিপরীত। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিজেএমসি'র ৫টি জুট মিল এবং বিটিএমসি'র ২টি টেক্সটাইল মিল নতুন করে চালু করেছে। এরফলে ৬১ হাজার জনবলের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রয়েছে ৯ হাজার ৪০টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প। বার্ষিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২% অথবা বলতে পারেন ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশের জন্য আয় করে আনছে। এটি হাসের স্বর্ণের ডিমের গল্পের মতো।

এ গল্প ছড়িয়ে আছে কৃষি খাতেও। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কার্যক্রম হাজার বছরের নিরন্ন, অবহেলিত বাঙালি কৃষকের জন্য গল্পের মতোই। এখানে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু করা হয়েছে, যা থেকে সরাসরি উপকৃত হবে লক্ষ-কোটি কৃষক পরিবার। কার্ডের সংখ্যা ২ কোটি ৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৮২৫টি। বিজ্ঞানীদের মূল্যায়ন করেছে সরকার, ফলে পাটের জীবন রহস্য থেকে শুরু করে আরো নানা গবেষণায় প্রাণ ফিরেছে। মাছেরও অভয়াশ্রম প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট থেকে জানলাম সারাদেশে মাছের ৭২৮টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা জানি না তাহলো প্রায় ২ কোটি মানুষ এখন মৎস্য খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত, আর এর মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ হচ্ছেন নারী। দেশের শুধু পুকুর-দিঘিতেই হেক্টর প্রতি বার্ষিক মাছ উৎপাদন ৪.৩৩ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য উন্নয়নের ছোটো একটি সারণি দেখতে পারি:

অর্থবছর	মাছ উৎপাদন
২০০৮-০৯	২৭.০১ লক্ষ মে. টন
২০১৪-১৫	৩৬.৮৪ লক্ষ মে. টন

সবচেয়ে ভালো লাগে যখন ইলিশ মৌসুমের প্রাক্কালে ১১দিন লাগাতার জাটকা ধরা বন্ধ রাখা হয়। এতে প্রচুর মা-ইলিশ তার ডিম নিরাপদে ছাড়তে পারে। এ বছর তো আমরা এর বিস্ময়কর ফল দেখতে পেয়েছি বাজারে ইলিশের প্রাচুর্য থেকে। ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন ৩৫ গুণ এবং জাটকার প্রাচুর্য ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা ধরা বন্ধ হলে জাটকা আহরণ করত এমন জেলেরা খাবে কী, তাই মানবিক ও জেলেবান্ধব সরকার এসব পরিবারে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৮১ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা শুরু করেছে, যেমন গ্রামের সাধারণ মানুষ পেয়ে থাকে। সারণির মাধ্যমে এই ইলিশ উৎপাদনটা দেখতে পারি, কারণ দেশের সকল নাগরিকেরই ইলিশের প্রতি আগ্রহ রয়েছে:

অর্থবছর	ইলিশ উৎপাদন
২০০৮-০৯	২.৯৯ লক্ষ মে. টন
২০১৪-১৫	৩.৮৭ লক্ষ মে. টন

মজার ব্যাপার হলো, সরকারকে দেখি, ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফাণ্ডও করেছে, অনেকটা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মতো। এ মডেল এখন প্রায় সকল খাতেই চাহিদা রাখছে।

সমুদ্র বিজয়ের ঘটনাটি ঘটেছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই। এখন বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমায় জ্বালানি, খনিজ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প ও কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে।

আমাদের ব্যক্তি-স্বভাব দীর্ঘদিন থেকেই ভালো হচ্ছে না, আর সেটা হলো জিনিসপত্রের দাম অযাচিতভাবেই বাড়িয়ে দেওয়া। এ ব্যাপারে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। দ্রব্যমূল্য সংহত রাখতে কোনো সরকারই পারবে না যদি আমাদের অতি মুনাফা ভোগ করার মানসিকতা না যায়। প্রতিবছরই সরকারকে সাধারণ মানুষের জন্য তাই স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের কর্মসূচি চালু করতে হয়। ২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকার প্রথমবারের মতো এ দেশে সুলভমূল্য কার্ডের প্রচলন করে। সারাদেশে এরকম কার্ডধারী ৭৭ লক্ষ পরিবার রয়েছে যারা সবসময় সুলভমূল্যে খাদ্যশস্য কিনতে পারে।

শিক্ষা খাতে টানাপোড়েনের মধ্যেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ নানারকম উদ্যোগ দেখতে পাই। একটা শিক্ষা আইন যা হবে এদেশে নতুন, তা করার চেষ্টা হচ্ছে, এর সামগ্রিক একটা প্রভাব সমাজে পড়বে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে দেশে জাতীয় পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা আছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটার পরিকল্পনা করেছেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদরাই। শিক্ষার মান উন্নয়নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে, এভাবেই তো আমরা এগিয়ে চলেছি। এর মধ্যে একটি, অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম। এটা শিক্ষা খাতে কী সুবাতাসই না বয়ে এনেছে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি বেশি বাড়ানো উচিত, আর একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও। আমাদের তরুণ সমাজের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহটি সহজাত, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও বাড়ানো প্রয়োজন। নিচের সারণিতে এ বিষয়ে একটি অগ্রগতি আমাদের আশ্বস্ত করে:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	পূর্বে ছিল	বর্তমানে হয়েছে
কারিগরি শিক্ষা	৩,১১৬টি	৫,৭৯০টি
বিশ্ববিদ্যালয়	৮৫টি	১২৯টি

গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে, সাউন্ড সিস্টেমে শিশু-কিশোররা ক্লাস করছে এমন দৃশ্য কিন্তু আমাদের আপ্লুত করে। 'প্রতিটি গ্রামে একটি স্কুল থাকবে' এমন একটি স্বপ্নের কথা ১৯৯৬ সালেই প্রথমবার ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন। এখন দেখছি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে এমন ১৫০০টি স্কুল তৈরি হয়ে গেছে। ২৫,৮৩৬টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। এর কারণে ৯১ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। নতুন করে এমপিওভুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত ৯১ জন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারী। নতুন করে এমপিওভুক্ত হয়েছে ১,৩৮৭টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা। মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে আমাদের সুশীল সমাজের একটা অকারণ উন্নাসিকতা রয়েছে। এ শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাই তাদেরকে এর সুপ্রভাব থেকে বঞ্চিত রেখেছে। বর্তমান সরকার এদের শিক্ষাকে বিশেষ করে কওমি মাদরাসার শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটা শত বছরের একটি অপেক্ষিত কাজ শেখ হাসিনার হাতেই ঘটল। আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই এজন্য তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি-সফলতা দান করবেন। 'স্কুল দিবস' চালু করেছে এ সরকার। এ দিবসে ৩৩ লক্ষ শিশু উচ্চশক্তি ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার খেয়ে থাকে। আমার মনে আছে, ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, শিশু-কিশোরদের কীভাবে স্কুলে প্রতিদিন দুধ-বিস্কুট খাওয়ানো যায়। স্কুল দিবসের কর্মসূচিতে বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এর পরিধি ও পরিমাণ আরো বাড়বে। বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনাটিই হচ্ছে অন্য সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকেও নিয়ে এগিয়ে চলা। সেই বোধ থেকেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ করছে সরকার। এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করবে বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটাল কর্মসূচির যে বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তাহলো, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ পাওয়ার কার্যক্রমটি। দেশের ৬৪টি জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে এই মোবাইল-ফোন-চিকিৎসা পদ্ধতি চলছে। এটি একটি নতুন বিষয়, বাংলাদেশ অতি দ্রুত যেমন পালটে যাচ্ছে এসব কার্যক্রম তারই ফসল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সেনা সদস্যরা সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে লড়াই করেছে, দুনিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে তা বিরল। আমাদের সেনা সদস্যরা এ সুনাম এখনো নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘ মিশন কার্যক্রমে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। ১,২৫,৭২৫ জন সেনা সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১১টি দেশে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের অবদান স্মরণে রাখতে সিয়েরালিওন তাদের দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে মর্যদা দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে গৌরবের।

মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। যারা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের জন্য জাতি ও রাষ্ট্রের এখনো অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে। বিমান, ট্রেন, বাস, স্টিমার যে পথেই যাবেন যিনি মুক্তিযোদ্ধা তিনি প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করবেন বিনা ভাড়ায়। এটা জাতির পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একটা সম্মান। যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন ততদিন জাতি যেন এভাবেই তাঁদের প্রতি ভালোবাসা জানাতে পারেন, আমাদের আশাবাদ সে পথেই। বর্তমান সরকারকে তাই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে হয় যে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এ বিরল আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনটি হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে লিগ্যাল এইড বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার ব্যবস্থা করে এ খাতেও জাতিকে কৃতজ্ঞতার পাশে বেঁধে রাখল বর্তমান সরকার। শুধু একটা মোবাইল ফোন দ্বারা কল দিয়ে স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি চরিত্র। বিচার ব্যবস্থায় ও ১৫টি চৌকি আদালত স্থাপন একই চেতনা থেকে জাত। অসচ্ছল নাগরিককে আইনি সেবা প্রদানের জন্য ৬৪টি জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপনও একইভাবে বিচার ব্যবস্থায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১৫ সন পর্যন্ত মোট ৪২টি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, এর মধ্যে ২২টি মামলাই নিষ্পত্তি হয়েছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্বচ্ছতার সঙ্গেই হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও সাহসই এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলেছে। দেশের একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কমরেড হায়দার আকবর খান রনো এ সরকারের একজন নিত্য সমালোচক। অথচ তিনি বারবার এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গেই লিখেছেন, শেখ হাসিনার সাহস এবং দৃঢ়তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজকে সহজ করে দিয়েছে, অন্য কেউ হলে তা সম্ভব হতো না।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সীমান্ত চুক্তি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হলো শেখ হাসিনার আমলেই। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল হস্তান্তরিত ঘটনা, দু'দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে নয় শুধু, সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলিতেও তা ইতিহাস সৃষ্টি করে রাখল। এটা একমাত্র শেখ হাসিনার কূটনৈতিক প্রজ্ঞায়ই সহজ হয়ে উঠেছে। তাঁর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাংলাদেশকে 'উন্নয়নের রোল মডেল' স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী *ফরেন পলিসি* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনেস্কোর শান্তিবৃক্ষ পুরস্কার এবং খেতাবও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমরা সুশীল সমাজ ও বিরোধী রাজনীতিকরা যোগ্যের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছি। এতে শেখ হাসিনার কোনো ক্ষতি হবে না, বরং আমরাই হীনমনা জাতি হিসেবে স্বীকৃত হব। শেখ হাসিনার মানবিক ও মাতৃসুলভ গুণাবলি ইউরোপের একমাত্র জার্মানির এঞ্জেলা মার্কেলের মধ্যেই দেখেছি। ১০ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার সাহস চাট্টিখানি কথা নয়।

৬ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা , ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুসমর্থন সংক্রান্ত দলিল হস্তান্তর করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব এম শহীদুল হক ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ড. এস জয়শংকর–পিআইডি

১৬ কোটি মানুষের সঙ্গে ১০ লক্ষ রোহিঙ্গার খাবার ভাগ করে নেওয়ার ঘোষণা সমসাময়িক বিশ্বে ছিল তুলনারহিত। আমরা কিন্তু তাঁর এই মানবিক উদারতাকে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করে চলেছি। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলে পরিবেশ নষ্ট হবে, সামাজিক সমস্যা হবে ইত্যাদি কথা বলে প্রকারান্তরে একদল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধেই নেমেছে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সুরই তাদের কণ্ঠে ভেসে উঠেছে। কিন্তু শেখ হাসিনা এখনো এ ব্যাপারে অবিচল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশের জলসীমায় উদ্ধারকৃত ২৫৫০ জনসহ প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশের নাগরিককে তিনি ফিরিয়ে এনে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

২০১৮ সাল থেকে যখন যানবাহনের চলাচলের জন্য পদ্মা সেতু খুলে দেওয়া হবে তখন শেখ হাসিনার বুকের সাহস বাংলাদেশের মানুষ আরেকবার দেখতে পাবে। এ সেতু যখন পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হবে তখন জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ১.২% বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিবছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য নিরসন হতে থাকবে। একই রকম চমক সৃষ্টি করবে রাজধানীর মেট্রোরেল, চট্টগ্রামের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি নদীর তলদেশের দীর্ঘ টানেল, দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, বিভিন্ন সড়কের চতুর্থ লেন ইত্যাদি। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার দিন থেকেই এর উপর দিয়ে ট্রেনও চলতে শুরু করবে এমন বিষয়টি এখন আর স্বপ্নের মধ্যে নেই, কঠিন হলেও বাস্তব হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেটও কাটা হচ্ছে এ বাংলাদেশে, এমন সংবাদের কতটুকু নিতে প্রস্তুত আছি আমরা পুরনোরা, কিন্তু এসব যে আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, আরো ঘটতেই থাকবে।

দেশে ৮টি নতুন স্থলবন্দর গড়ে উঠেছে, ৯টি অচল বন্দর সচল হয়েছে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্রবন্দর। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নামে সরকার যে নতুন একটি সংস্থা করতে যাচ্ছেন তার প্রতি জনগণের আগ্রহ রয়েছে। কারণ গ্রামীণ মানুষের এখনো নদীপথে যাতায়াতের অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্ব পর্যটন বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আগের তুলনায় এখন অনেক সুসংহত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে উন্নয়ন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় অনেক দ্রুতই ঘটছে।

পাশাপাশি খেলাধুলায় বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বে ঈর্ষণীয়। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক আসরে বাংলাদেশ ছিল সহআয়োজক। ওয়ার্ল্ড টিটুয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০১৪ ও এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০১৪-এর সফল আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ। অনেকগুলো ওয়ানডে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। টেস্টেও তার সাফল্য আছে। মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশের অবস্থান এখন সাত নম্বরে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ এবং এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাদেশ ফুটবলেও তার হারানো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পেরেছে।

এবার একটু অন্যদিকে যাই। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যখন আপনি বেড়াতে আসবেন তখন এখানে দেখবেন বাংলাদেশের হৃদয়টা কেমন করে কাজ করছে। এমন কতকগুলো মানুষের পাশে বাংলাদেশের অর্থকরী সম্পদ ব্যয় হচ্ছে দেখে মনটা আপ্লুত হয়ে যায়। সারণিতেই দেখতে পারি বিষয়টি:

বিষয়	পূর্বে ছিল	বর্তমানে আছে
বয়স্ক ভাতাভোগী	২০ লক্ষ	২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ জন
বিধবা ভাতাভোগী	৭ লক্ষ ৫০ হাজার	১০ লক্ষ ১২ হাজার
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী	২ লক্ষ	৪ লক্ষ

দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এদের ভাতার পরিমাণও বেড়ে চলেছে। শুরু হয়েছিল স্বল্প নিয়ে, স্বল্প দিয়ে, এখন সংখ্যা ও পরিমাণ বেড়ে গেছে অনেকদূর। সরকার অব্যাহত থাকলে বাড়তে থাকবে এসব কর্মসূচিও। ভাতা উত্তোলন যাতে সহজ হয়, এই অবহেলিতদের নিয়ে যাতে কেউ দুর্নীতি করতে না পারে, সেজন্য ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাবও করা হয়েছে। পাশাপাশি হিজড়া জনগোষ্ঠী, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়কে নিয়েও নানা কর্মসূচি চালু করেছে সরকার। চা শ্রমিকদের জীবন কিছুটা ভিন্ন রকম, তাদের জন্যও চালু করেছে আলাদা কর্মসূচি।

স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কাজের বাইরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪ হাজার নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ করেছে এবং এসব বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লক নির্মিত হয়েছে ১৫ হাজারটি। দেশে নতুন আরো ১১টি উপজেলা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের চরাঞ্চলের মানুষ যাদের আমরা দীর্ঘদিন থেকেই ভুলে বসে আছি সেখানেও সরকারের বিশেষ কর্মসূচি কাজ করছে।

গৃহকর্মীদের নিয়ে বর্তমান সমাজে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ করা যায়। বর্তমান সরকারকেও দেখি 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি' তৈরি করেছেন যাতে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প এ কাজে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রায় ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজারেরও বেশি কর্মী বিদেশে নতুন করে কর্মসংস্থান লাভ করেছে এবং তাদের কাছ থেকে রেমিটেন্স এসেছে ৯২.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে বাংলাদেশের জনসম্পদ কাজ করছে। সর্বকালের এ রেকর্ডটি ঘটেছে বর্তমান সরকারের আমলে। ৪৩টি পেশায় ৫১টি দেশে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গভীর মনোযোগের দাবি রাখে। তাদের মোট সংখ্যাটিও প্রণোদনামূলক, প্রায় ২ লক্ষ

৩৩ হাজারেরও বেশি নারী কর্মীর কর্মসংস্থান ঘটেছে এসব দেশে।

চাল রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি গৌরবের। শেষ পর্যন্ত যে হাজারীবাগ ট্যানারি সাভারে স্থানান্তর করা গেছে এবং একটি চামড়া শিল্পনগরী দেশে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাতে সকলেই স্বস্তি প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি এতদিন ছিল অপেক্ষিত, এ সরকারের আমলেই গণমাধ্যমের জন্য এ সুখবরটি ঘোষিত হয়েছে।

বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য একটি বড়ো সুসংবাদ এসেছে ১৮৫টি উপজেলায় বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার খবরে। বাংলাদেশের ইন্টারনেট গ্রাহক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অগ্রগতির তথ্যের জন্য নিচের সারণিটি দেখা যেতে পারে:

সাল	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা
২০০৮	৪৪ লক্ষ
২০১৭	৭.৯২ কোটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অধীনে দেশের ২১টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার সেন্টার কাজ করতে শুরু করেছে। আরো প্রতিষ্ঠানে কাজ চলছে।

বাংলাদেশে নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে পলিথিন শপিং ব্যাগের অবৈধ ব্যবহার কী পরিমাণ হয় এবং গাড়িতে এখনো কালো ধোঁয়া যেমন নিঃসরণ হচ্ছে তার সংখ্যাটা বোঝা যায় জরিমানা আদায়ের পরিমাণ থেকে। এ বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে সরকার।

রাজধানীর লালবাগ কেল্লায় যে 'লাইট এন্ড সাউন্ড শো' চালু করা হয়েছে তা দেশের মানুষকে তাদের ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনার ধারায় আরো শানিত করে তুলবে। একুশে পদক বাঙালির গর্বের ও গৌরবের। এর মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে সম্মানীর হারও বর্তমান সরকার আরো বাড়িয়েছে যা সকল মহল থেকে প্রশংসিত হয়েছে:

একুশে পদক	
সাল	প্রদত্ত অর্থ
২০০৮	৪০,০০০/-
২০১০	১,০০,০০০/-
২০১৬	২,০০,০০০/-

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিন আগে কম্বোডিয়া সফরকালে নমপেনে একটি কথা বলেছেন, কথাটির গুরুত্ব হয়ত আমরা পুরোটা বুঝিনি। তিনি বলেছেন, বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে হাত দেওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সবার মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সবাই এখন সমীহ করে কথা বলে।' [এ ভাষাটি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের সকল জাতীয় দৈনিকেই। আমি এখানে ব্যবহার করেছি ঢাকার দৈনিক *সমকাল*, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা থেকে হুবহু]। কথাটি যে কতখানি সত্য তা বিশ্বব্যাংকের বিবৃতিতেও ভেসে উঠেছে। ২০১২ সালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল করে, অথচ এখন তারা বাংলাদেশের প্রশংসা করছে। পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হওয়ায় বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে তারা খুশি। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এই সেতু দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক বৈষম্য কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৩০ সেপ্টেম্বর (২০১৭) পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটির ওপর প্রথম স্প্যান বসানোর দিনই বক্তব্য জানতে *বাংলা ট্রিবিউন* থেকে বিশ্বব্যাংকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এর দুই মাস পর ২ ডিসেম্বর ই-মেইলে এর উত্তর পাঠানো হয়, এতে পদ্মা সেতু বিষয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। [দেখুন, সমকাল, ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪]।

অথচ আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এখনো লিখে চলছেন,'বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ কোথায়? '[প্রথম আলো ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৭]। রোহিঙ্গা প্রশ্নে রাশিয়া-চীনকে পাশে না পাওয়াতেই তাঁদের এ হতাশা। মনে রাখতে হবে, রাশিয়া-চীন পরাশক্তি, পরাশক্তির আচরণ পরাশক্তির চরিত্র অনুযায়ীই হবে। আবার আমেরিকা রোহিঙ্গা প্রশ্নে পাশে আছে দেখে বাংলাদেশের শক্তি বোঝায় না, যেমন রাশিয়া-চীন পাশে না থাকায় দুর্বলতা বোঝাচ্ছে না। বাংলাদেশকেই তার প্রতিবেশীর সঙ্গে যুঝতে হবে, বুঝতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশ যা করছে, তাতে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে ত্রুটি ধরার প্রয়োজন নেই। এজন্য আমাদের প্রয়োজন ধৈর্য ও স্থৈর্য। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা বিফলে যাবে না।

বাংলাদেশকে বিশ্বে কোথায় দেখতে পাবেন, যখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে, যখন বাংলাদেশের সুন্দরবন, সর্বশেষ শীতলপাটিও বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করে।

পৃথিবীর প্রথম নাগরিকত্ব পাওয়া রোবট সোফিয়াও সেদিন বলে, 'আমি জানি জামদানি বিশ্বের সেরা কাপড়'। বাংলাদেশকে আপনি খুঁজে পাবেন আমেরিকায় অবস্থিত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসায়, সেখানে নাসার সেরা উদ্ভাবকের পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের মাহমুদা সুলতানা। [পাক্ষিক *অন্যদিন*, ১-১৫ জানুয়ারি ২০১৭]। বাংলাদেশকে খুঁজে পাবেন ফজলে হোসেন আবেদের মধ্যে, যিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১টি দেশে উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি বিশ্ব জুড়েই পাচ্ছেন, সর্বশেষ ইতালির লাউদাতে সি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। [*প্রথম আলো*, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫]।

বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে নানারকম আলোচনায় আছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম *দ্য ইকোনমিস্ট* তার ওয়ার্ল্ড ইন ফিগার ফিচারে জানিয়েছে, চা পানে বিশ্বে দশম স্থানে আছে বাংলাদেশের নাগরিকরা। [ডিসেম্বর-২০১৭ সংখ্যা] বাংলাদেশের একটি শিল্প সংস্থা আরএফএল আমাদের অর্জনগুলোর একটি প্রদর্শনী করেছিল ডিসেম্বরে–বিজয় মাসে। সেখানে দেখার জন্য একসময়ের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল উদ্যোক্তারা। এরকম আরো নানা ঘটনাই ঘটল এবং ঘটতে থাকবে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এসব নিয়ে লিখে যাওয়াই যায়। কিন্তু কথা সেখানে নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো বা বাংলাদেশ বিষয়ে অর্জন ও সুখ্যাতিগুলো সব রুটিন কাজ ছিল না। পরিকল্পনায় যে মেধা ও শ্রম সাজানো হয়েছিল তা-ই মূল লক্ষপথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই হয়ত এতে খুশি নই, কারণ বেশি বেশি উন্নয়ন হয়ে গেলে আমরা বক্তৃতা দেব কী নিয়ে! রাজনীতির বিষয় তখন কী হবে!

আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণতন্ত্র দরকার, তবে তার আগে প্রয়োজন উন্নয়ন। পেটে ভাত না থাকলে কেউ আমাদের পাত্তা দেবে না, লাঞ্ছিত ও অপমানের জীবন বইতে হবে। তাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি গণতন্ত্রও চলতে থাকবে।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক (মেইল: drhannapp@yahoo.com)

প্রথম শহিদমিনার

এম আর মাহবুব

শহিদমিনার আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৫২ সালের পর থেকে শহিদমিনার আমাদের সকল গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একমাত্র আশ্রয় ও উৎসস্থল হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। শহিদমিনার আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি হাসি-কান্নার ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী, আমাদের অস্তিত্বের প্রহরী। তাছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর শহিদমিনার আমাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে। শহিদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যই শহিদমিনার নির্মাণের কথা চিন্তা করা হয়। ঢাকায় প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের এক রাতের যৌথ শ্রমে। আহমদ রফিক বলেন,

'মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়িত করা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক যৌথ চিন্তা ও শ্রমের প্রতিফলন।'

ঢাকায় প্রথম শহিদমিনার, ছবি: ড. এ. হাফিজ

শহিদমিনার নির্মাণের পরিকল্পনা, নকশা নির্বাচন ও প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম শহিদমিনারের অন্যতম স্থপতি ডা. শরফুদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'একুশ-বাইশ দুই দিনের রক্তঝরা নিয়ে আমরা সবাই তখন খুব উত্তেজিত। তেইশ তারিখ সকালে ৩ নম্বর শেডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল পুলিশের লাশ গায়েব করা এবং শহিদদের নিয়ে। ঠিক এমন সময় আমাদের মধ্যেই কে একজন কথাটা তোলেন এই বলে যে, শহিদদের জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানালে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠল, তাই হোক। কেউ কেউ বলল, 'আজই হোক'। প্রশ্ন উঠল নকশার, মালমসলার। নতুন কলেজ ভবন তৈরির জন্য ইট-বালি সবই জমা আছে কলেজ চত্বরে, সিমেন্ট আছে গুদামে। কিন্তু নকশা?

মওলা ভাই (কলেজ ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মাওলা, তিনি তখন সংগ্রাম পরিষদের নয়া আহ্বায়ক) বললেন, বদরুলের আঁকার হাত ভালো, সেই পারবে। নকশা আঁকার ভার পড়ল বদরুল আলমের ওপর। প্রথম নকশাটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়বার করা হলো, সঙ্গে আরো দুই একজন যোগ দিল। হায়দার ভাইও বোধহয় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যে নকশাটা দাঁড় করানো হলো সেটাই মনোনয়ন পেল। এরপর কাজ শুরু। তাই বলি, পরিকল্পনা সমষ্টিগত যেমন শুরুতে তেমনি কাজের শেষে।'

প্রথম শহিদমিনারের অন্যতম নকশাকার ডা. বদরুল আলম বলেন, '২২ ফেব্রুয়ারিতে মিছিল, সভা আর পোস্টার আঁকা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। রাতে ক্লান্তিতে ঘুমে বিভোর ছিলাম হোস্টেলে। হঠাৎ মধ্যরাতে, কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। বলল, তোমাকে মওলা ভাই (তৎকালীন ভিপি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ) ডাকছেন। আমার আঁকার হাত ভালোই ছিল। তাই মওলা ভাই ও আরো কিছু ছাত্র আমাকে বললেন, ভাষার জন্য ছেলেরা রক্ত দিল, এটা ধরে রাখার জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভের নকশা বানিয়ে নিয়ে দিও। তখন এত রাতে আমার মাথায় কিছুই আসছিল না। হঠাৎ মনে হলো, ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওখানে খুব সুন্দর ইট বাঁধানো একটা স্তূপ ছিল। বাবা বললেন, এটা স্মৃতিস্তম্ভ। কেউ মারা গেলে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এটা বানানো হয়। সেই স্তূপ কল্পনা করে একটি নকশা করলাম। কারো তেমন পছন্দ হলো না। পরে ভিক্টোরিয়া পার্কে সিপাহি বিদ্রোহের যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, সেটির আদলে একটি নকশা বানালাম। অধ্যাপক মির্জা মাজহারুল ইসলামের ঘরে বসে বানাই সেটা। সবার পছন্দ হলো। রাতেই ইট, সিমেন্ট, বালু ও রাজমিস্ত্রি জোগাড় হয়ে গেল। ভোর পাঁচটার মধ্যে ১০ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট প্রস্থের শহিদমিনার তৈরি হলো। ২২ ফেব্রুয়ারি সেই রাতে হোস্টেলের সবাই অংশগ্রহণ করেছিল শহিদমিনারটি তৈরি করতে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।'

প্রথম শহিদমিনারের স্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে আহমদ রফিক বলেন: 'মিনারটি তৈরি করা হয় ব্যারাকের প্রধান গেটের কাছাকাছি বারো নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে শহিদ আলীম চৌধুরীর কক্ষটি থেকে সামান্য দূরে। কোনাকুনিভাবে ব্যারাকের মধ্যবর্তী রাস্তার গা ঘেঁষে। উদ্দেশ্য যাতে বাইরের রাস্তা থেকে সহজেই চোখে পড়ে এবং যে-কোনো শেড থেকে বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাটিতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। বর্তমান পরিবেশ আউটডোর ডিসপেন্সারি ভবনটির নিচে উত্তর-পশ্চিম কোণে কোথাও চাপা

ডা. বদরুল আলম

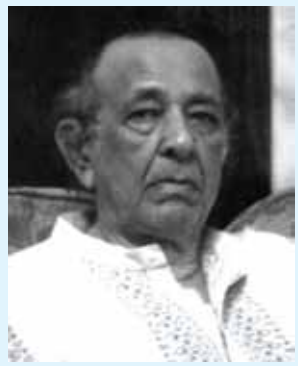

ডা. সাঈদ হায়দার

অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম

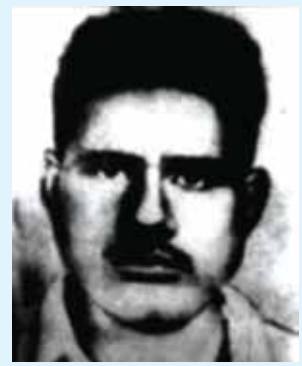

পিয়ারু সরদার

পড়ে আছে প্রথম শহিদমিনার তৈরির স্থানটি।

ঘটনাক্রমে ঐ স্থানটি ছিল আবুল বরকতের গুলিবিদ্ধ হবার স্থানের নিকটেই। ঘাসে তখনো হয়ত মার্চের মতো শুকনো রক্তের দাগ মুছে যায়নি। এ স্থাপত্যের নামফলকে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। ফলকের লেখা বদরুল আলমের সুশ্রী হস্তাক্ষরে।'

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদমিনারের নির্মাণকাজ শুরু ও শেষ হয়। শহিদমিনার তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করা হয় মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকেই। কলেজ সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত ইট, বালু ব্যবহার করা হয় এবং সিমেন্ট সংগ্রহ করা হয় কলেজ প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত ঠিকাদারি পিয়ারু সরদারের সিমেন্টের গুদাম থেকে। বাংলা ভাষা দরদি পিয়ারু সরদার সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর গুদামের চাবি ছাত্রদের হাতে হস্তান্তর না করলে প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হতো কি-না সন্দেহ। প্রথম শহিদমিনারের ইতিহাসে পিয়ারু সরদারের নামটি খুবই স্মরণীয়। সারা রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেডিক্যাল ছাত্ররা গড়ে তোলেন এই অমর স্থাপত্য কীর্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রথম শহিদমিনার নির্মাণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সকল ছাত্ররাই অংশগ্রহণ করেছিল। রাজমিস্ত্রি, যোগালি-উপকরণ সংগ্রহ, সবই ছিল মেডিক্যাল ছাত্রদের শ্রম নিয়েই।

২৫ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* পত্রিকায় প্রথম শহিদমিনার নির্মাণের সংবাদটি প্রকাশিত হয় এভাবে:

> শহীদ বীরের স্মৃতিতে (স্টাফ রিপোর্টার)
>
> রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের যে সব শহীদ বীর গত ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে বুকের রক্তে ঢাকার মাটি রাঙ্গাইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

প্রথম শহিদমিনারের প্রথম আলোকচিত্র শিল্পী

প্রথম শহিদমিনারের প্রথম ছবি তুলেছিলেন তৎকালীন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আব্দুল হাফিজ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। কর্মজীবনের পুরোটাই কেটেছে প্রবাসে। ১৯৯৯ সালে অবসর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং অদ্যাবধি সেখানেই অবস্থান করছেন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংক্ষিপ্ত এক সফরে তিনি ঢাকায় আসেন। আমি তাঁকে ধানমন্ডিতে অবস্থিত ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাই। তিনি সানন্দে রাজি হন এবং ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘরে আসেন। সেখানেই কথা হয় তাঁর সাথে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং প্রথম শহিদমিনারের ছবি তোলা প্রসঙ্গে তিনি খোলামেলা কথা বলেন। তিনি একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাকে (লেখক) বলেন, '... ২২ তারিখ সকালে ব্যারাকে চলে আসি। গায়েবানা জানাজায় অংশ নেই। ২২ তারিখেও গুলি হয়। বেশ কয়েকজন মারা যায়। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। সেদিন আমার হাতে ক্যামেরা ছিল। আমি মর্গে গিয়ে গোপনে মরদেহের ছবি তুলি। আমি নিজে সাতটি মরদেহ দেখতে পাই। মরদেহের ছবি *আজাদে* ছাপা হয়েছিল। ছবির নিচে আমার নামও ছাপা হয়। এরপর থেকে পুলিশ আমাকে খুঁজতে থাকে। ২৩ তারিখ আমি ব্যারাকে চলে আসি। ফজলে রাব্বীর রুমটি ছিল আমার আস্তানা। আমরা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির সিদ্ধান্ত নেই। বদরুল আলম ছিলেন অঙ্কনে পারদর্শী। তাঁকে দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা তৈরি করা হলো। আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মওলা ও জিএস শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে আমরা সারা রাত জেগে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলাম।

২৪ তারিখ ভোরে আমি বাসায় চলে আসি। আমার মাকে শহিদমিনার তৈরির ঘটনা বলি। আমি তখন থাকতাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আবাসিক ভবনে। মা এসব কথা শুনে শহিদমিনার দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। আমি তাঁকে নিয়ে শহিদমিনারে চলে আসি। আমাদের বাসার নিচতলায় ছিল হলুদ গাঁদাফুলের বাগান। সে সেখান থেকে ফুল নিয়ে মালা তৈরি করেন শহিদমিনারে দেয়ার জন্য। মা ফুলের মালা রাখলেন শহিদমিনারে। তখনই আমি ছবি উঠালাম। আমার মেজোভাই আবদুল আজিজ কৃষি বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে আমার জন্য একটি ক্যামেরা নিয়ে আসেন। ক্যামেরাটি ছিল Boight glander Vito-2 35mm ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েই আমি প্রথম শহিদমিনারের ছবি তুলি। আমি নিজে সে রাতেই ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করি। পাটুয়াটুলির পি. মুখার্জী স্টুডিওতে আমি খণ্ডকালীন কাজ করতাম। সেখানে ছবি উঠানো, ডেভেলপ ও প্রিন্ট করার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। ছবি প্রিন্ট করে আমার কাছে একটা রাখি, একটা বড়োভাই আবদুর রশিদকে এবং একটা মেজোভাই আব্দুল আজিজকে দেই। ছবির নেগেটিভটি আজও আমি যত্ন করে রেখেছি। পুলিশ ঘটনা জেনে যায় এবং আমাকে খুঁজতে থাকে। আমি পালিয়ে চট্টগ্রামে চলে যাই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ঢাকায় আসি।' (সূত্র: লেখকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ডা. এ হাফিজ, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬)

প্রথম শহিদমিনারের আরও দু'জন ছবি তুলেছিলেন– জামিল চৌধুরী এবং অন্যজন ডা. মঞ্জুরুল হক। তবে ডা. এ হাফিজই প্রথম ছবিটি তুলেছিলেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর

একুশ আমার

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

একুশ আমার শুভ্র জোছনায় লাল পলাশের হাসি
একুশ আমার গাঢ় নীলাকাশে ছায়াপথ রাশি রাশি।
একুশ আমার মিঠা জলময় পদ্মা-যমুনা-মেঘনা
একুশ আমার দূর পাহাড়ের মিষ্টি জলের ঝরনা।
একুশ আমার দমফাটা হাসি শিমুলের ডালে ডালে
একুশ আমার অবিনাশী চাঁদ কিশোরীর দুটি গালে।
একুশ আমার মধু ফাগুনের আম্রমুকুলের ঘ্রাণ
একুশ আমার নদীতীর জুড়ে মহীরুহ– মহাপ্রাণ।
একুশ আমার চৈতী রজনীর চাঁদ-জোছনার খেলা
একুশ আমার বটের ছায়ায় বোশেখের মধুমেলা।
একুশ আমার জ্যৈষ্ঠ দুপুরের ঘুঘুডাকা শালবন
একুশ আমার আষাঢ়ের কালে বরষার আবাহন।
একুশ আমার শ্রাবণ ধারায় বালিকার ডুবোখেলা
একুশ আমার ভাঁদরের জলে ভাসমান স্বপ্নভেলা।
একুশ আমার শিশিরের ছোঁয়া আশ্বিনের সন্ধ্যাবেলা
একুশ আমার কার্তিক সকালে মিঠেকড়া রৌদ্রমেলা।
একুশ আমার অঘ্রাণ মাসের ধান মাড়ানোর গান
একুশ আমার পৌষ পার্বনের মিষ্টি পায়েসের ঘ্রাণ।
একুশ আমার মাঘের সকালে ফাগুনের হাতছানি
একুশ আমার বারোমাসি গান ছিনিয়ে দিয়েছে আনি।
একুশ আমার হাঙরের চোখ উপড়িয়ে ফেলার দিন
একুশ আমার শহিদ ভায়ের তাজা রক্ত-ঋণ।
একুশ আমার অসীম আকাশ মায়ের এলানো কেশ
একুশ আমার সোনালি সকাল দিয়েছে স্বাধীন দেশ।

ভাষার জন্য

দেলোয়ার হোসেন

যে মাটিতে মায়ের ছায়া
নরম মাটি কঠিন শিলা
মাঠে মাঠে সোনা ফলে,
সেই মাটিতেই অবিচারের
প্রতিবাদে হাড় কাঁপানো
জনগণের মিছিল চলে।
যে মাটিতে জন্মেছিল
সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত
এবং আরো সোনার ছেলে,
বাহান্নতে ভাষার জন্য
জীবন দিয়ে রেখে গেল
মায়ের ভাষার প্রদীপ জ্বেলে।
বাংলা ভাষার কবর দিতে
পাকিস্তানের জিন্নাহ বলেন
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা,
ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
উঠল ক্ষেপে শ্রমিক-চাষা।
ভরকে গেল পশ্চিমারা
বাঙালিদের বিজয় এল
তৈরি হলো শহিদমিনার,
প্রতি বছর শ্রদ্ধা জানাই
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
থাকতে রাতের আবছা আঁধার।

বাংলা আমার চর্যাপদের

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

বাংলা আমার চর্যাপদের, বাংলা আমার প্রাণ–
একুশ তোমায় স্মরণ করি গাই বাংলার গান।
মায়ের মুখে বাংলা ভাষা আমরা খুঁজে পাই–
ভায়ের দানের অমর ভাষা তোমায় ভুলি নাই।
মায়ের ভাষা ভালোবাসা চোখের নয়নমণি–
শহিদ ভাইয়ের দানে পেলাম, বাংলা ভাষার খনি।
লড়াই করে তাঁরা যখন ভাষার দাবির জন্য–
রক্ত দিয়ে আনল ভাষা, আমরা সবাই ধন্য।
ফুলের বনে থরে থরে রঙিন রঙিন ফুল–
বাংলা ভাষার বর্ণমালা আমার মায়ের দুল।
আমার কাছে অতি মধুর মায়ের মুখের ভাষা
ভাষার গানে হৃদয় ভরায় অনেক স্বপন-আশা।
এ দেশ আমার পরম প্রিয় রঙের আঁকা তুলি
মায়ের মতো মাতৃভূমি কেমন করে ভুলি।
মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা অনেক ভালোবাসি
প্রিয় বাংলার বর্ণমালা লক্ষ মায়ের হাসি।
প্রভাত বেলায় রবির হাসি, রাতে তারার মেলা
হাসনাহেনা সুবাস ছড়ায় হিম কুয়াশার খেলা।
শিমুল-পলাশ রক্তরাঙা পুবাল বায়ে দুলে–
ভাই হারানোর শোকের ছবি হাজার ফুলে ফুলে।
ফেব্রুয়ারির অমর একুশ এই হৃদয়ে গাঁথা–
শহিদ ভাইয়ের শোকের স্মৃতি বুকের মাঝে পাতা।
রফিক-শফিক-সালামেরা সব মানুষের প্রিয়–
তাঁদের স্মৃতির স্মরণগীতি হাজার কণ্ঠে নিও।

বর্ণমালার রৌদ্দুরে

রীনা তালুকদার

বর্ণমালা শহিদের রক্তের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ
নিয়ে ঘুরছে জাতির উত্তরসূরি
লাঙলের ফলায় কর্ষিত উষর ভূমিতে নাইট্রোজেন আধিক্য
বীজ নষ্ট হচ্ছে যথাযথ অক্সিজেন প্রক্রিয়ার অভাবে
কৃষ্ণবৃত্তে জন্মোৎসবের কোলাহল
ডারউইন নাকাল হয় অন্ধকারে
নাব্যতা হারানো নদী যত্নে পায় কোমলতা
সময় অতিক্রম করে বলার থাকে না কিছুই কারো
টকটকে রক্ত ঝরছে স্বচ্ছ টলটল খেজুর রস ঝরছে
সাদা সোনা রাবার রস ঝরছে বন জুড়ে
শান্তিপ্রিয় নাগরিক সাতে-পাঁচে নেই
তবুও ভোগান্তি নিত্য সঙ্গীসাথি
বর্ণের শব্দ তরঙ্গ বিস্ময়ে থ মুখে
জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে
বর্ণমালার মুক্তির সংগ্রাম চলছে যুগ যুগ
ঊনপঞ্চাশটি বর্ণমালা এখনো মুক্তি পায়নি।

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

শামসুজ্জামান শামস

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হন। এসময় নবগঠিত দুটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ব বাংলার প্রতি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভাষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজ-উদ-দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন, অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন আন্দোলনে। সেকথা ফুটে উঠেছে অন্য ভাষা সংগ্রামীদের আত্মকথায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতেও সেসময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের কথা সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।' ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। (সূত্র : 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা', গাজীউল হক, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমুদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহুকাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন' (সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কৃত-মযহারুল ইসলাম : ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ : পৃ. ১০৪) তিনি ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে নেতৃত্বদান করেন।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম সফল হরতাল। এই হরতালে শেখ সাহেব নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেফতার হন। ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তাঁর *'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫'* গ্রন্থে লিখেছেন, 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন।' ১১ মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে যুবক শেখ মুজিব এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এ হরতাল ও কর্মসূচি তাঁর জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তাঁর প্রথম গ্রেফতার।'

১১ মার্চের হরতাল সফল করতে ১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে প্রচারমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম (তমুদ্দুন মজলিস সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য), নঈমুদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক) এবং আবদুর রহমান চৌধুরী (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা)। জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। ১১ মার্চের গ্রেফতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ১১ মার্চের গুরুত্ব এবং গ্রেফতার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ (সূত্র : *দৈনিক আজাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। সেদিনই সকাল ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেফতার হই। আমার সহকর্মীদেরও গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে আন্দোলন

চলতে থাকে।' ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সঙ্গে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলখানায় আটক ভাষা আন্দোলনের কর্মী-রাজবন্দিদের চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় এবং অনুমোদন নেওয়া হয়, অনুমোদনের পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কারাবন্দি অন্যদের সঙ্গে শেখ সাহেবও চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক শেখ সাহেবসহ অন্য ভাষাসৈনিকরা কারামুক্ত হন। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার এদেশবাসীর কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। ১৫ মার্চ আন্দোলনের কয়েকজন নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি শুরু করে। এতে শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে বঙ্গবন্ধুর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'এমএলএ-দের বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে বিক্ষোভ হয়। তাদের গালাগালি ও অনেক ক্ষেত্রে মারধর করা হয়। মোয়াজ্জেম ডাক্তার নামে বাগেরহাটের এক এমএলএ-কে ধরে নিয়ে মুসলিম হলে ছাত্ররা আটক করে। সেখানে গিয়ে আমি তাকে ছাড়াই। শওকত সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বেশ আঘাত পায় পুলিশের হাতে'।

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিলে নেতৃত্বদানের সময় শেখ মুজিব বন্দি হন এবং মুক্ত হন '৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, '১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।' (সূত্র : ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, গাজীউল হক)। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু সে সময় কারাগারের দিনগুলোর কথা, বাইরের রাজপথের নানান কথা তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে এনেছেন। তিনি বলেছেন, '২১ ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'—আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'—বললেই তো হতো।'

১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিলাভ করেন। ২৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসে যে কর্মসূচি নেওয়া হয় তা পালনের জন্য নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিব। ঐদিন সকাল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সাইকেলে করে গোটা ঢাকা শহরে টহল দিয়ে বেড়ান এবং মিছিলের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। পরে আরমানিটোলা ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা দেন। তাঁর অনুরোধে গাজীউল হক নিজের লেখা প্রথম গানটি 'ভুলবো না...' পরিবেশন করেন। সভায় অন্যান্য স্লোগানের মধ্যে-রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, গণপরিষদ ভেঙে দাও, গণপরিষদ ভেঙে দাও, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণের পর এর চেতনাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। পরবর্তীকালেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকারের সেই একই দাবি ও কথাগুলো আরো বর্ধিত উচ্চারণে জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।' (সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)

১৯৭২ সালের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল নায়ক ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা আন্দোলনেরই সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি' (দৈনিক সংবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন বিকাশে ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের সফল, সার্থক ও যোগ্য নেতা ছিলেন বলেই ভাষা সমস্যার ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। এই মহান নেতা বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে তিনি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ।

লেখক : সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

ভাষা আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : নারীর প্রজ্ঞা

সেলিনা হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে জেলে অবস্থানকালে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচদিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় স্কুলের মেয়েরা ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটুও ক্লান্তও হতো না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'—নানা ধরনের স্লোগান। এই সময়ে শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাষা আন্দোলনে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন করেছিলেন। নারীর ভূমিকাকে তিনি মূল্যায়ন করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে- স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে এবং বড়ো পরিসরে। লক্ষ্য অর্জনে নারী-পুরুষের সমতার জায়গা থেকে। অথচ আজ পর্যন্ত এটি একটি অবধারিত সত্য যে, ইতিহাসের মূলধারায় নারীর অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় না। ইতিহাসবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে পাশ কাটিয়ে যান কিংবা খানিকটুকু স্বীকার করলেও স্বীকারের মাত্রা বিস্তৃত বিশ্লেষণ পায় না। ফলে নামমাত্র উল্লেখে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে একরৈখিক করে রাখে। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। অথচ এই আন্দোলনে নারীর ভূমিকা গৃহিণী থেকে শুরু করে গণপরিষদের সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী তার ভূমিকাকে সক্রিয় রেখেছে।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে একটি রক্ষণশীল রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে নারীর সর্বত্র অভিগম্যতা সহজ বিষয় ছিল না। তারপরও ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সূচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী ধর্মের ধুয়া তুলে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সভায়-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি স্কুলের ছাত্রীরাও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। তাঁরা কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সচেতনতাবোধ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রওশন আরা বাচ্চু তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমরা সেই সময়ে ঘরে ঘরে গিয়েছি। বেশিরভাগ নারী তো চাকরিজীবী ছিলেন না। তারা তাদের একটি গয়না দিয়েছেন, কিংবা যিনি পেরেছেন তিনি টাকা দিয়েছেন। আমরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদার কথা বুঝাতাম। আমাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা কেন জরুরি সেকথা বলতাম। এভাবে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের পক্ষে সচেতনতা গড়ে তুলেছিলাম। মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, এটিও ছিল তার অন্যতম কারণ।' তিনি আরো বলেছেন, 'পরিবারের বাধার কারণে মেয়েরা অনেক সময় বোরকা পরে মিছিলে আসত। একবার বাংলাবাজার স্কুলের এক ছাত্রীকে মা মিছিলে আসতে দেবে না বলে চুল কেটে দিয়েছিল। মেয়েটি মাথায় ওড়না প্যাঁচিয়ে মিছিলে এসেছিল। এভাবে মেয়েরা সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে।' রওশন আরা বাচ্চুর স্মৃতিচারণায় দুটি বড়ো জিনিস উঠে আসে। একটি নারীদের গায়ের গয়না খুলে দেওয়ার বিষয়। অন্যটি পরিবারের বাধা উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণ। নারীরা প্রথমটায় নেপথ্য কর্মী-অর্থ দিয়ে আন্দোলন পরিচালনার কাজটি করেছে। আন্দোলনের ধারাটি বেগবান রাখার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়টি ছিল সরাসরি অংশগ্রহণ। ছেলেদের ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা কম থাকে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার কাজটি ছেলেদের জন্য বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা নয়। তারপরও মেয়েদের অবস্থান ছিল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, মেয়েদের বেড়ি ভেঙে এগোতে হয়েছিল। এই কঠিন কাজটি মেয়েরা করেছিল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিবেচনা থেকে। অস্তিত্বের সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রবল তাড়নায়। ইতিহাস এভাবেই এগোয়। ইতিহাস এভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় অর্জন করে গৌরব। নারীকে বাদ রেখে ইতিহাসের কোনো বড়ো অর্জন কখনোই সম্ভব হয়নি। বরং বড়ো অর্জনের দুর্ভোগের দায়ভারও নারীকে প্রবলভাবে সইতে হয়।

বলছিলাম ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের কথা। দেশ ভাগের পরে পার হয়ে যায় সাড়ে চার বছর। বিভিন্ন সময়ে ভাষার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ছাত্রসমাজ। শাসক গোষ্ঠীর হুংকার ছিল- উর্দু, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্ররা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে ফেটে পড়েছিল। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার লাইব্রেরি হলে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সভা, হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় ছিল গণপরিষদের অধিবেশন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপরিষদের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচিও ছিল। ছাত্রসমাজের এমন কর্মসূচিতে বিচলিত বোধ করে সরকার। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমীন। তার সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে।

২১ তারিখ সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জমায়েত হয়। কারণ, ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ড. সুফিয়া আহমদ স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আনন্দময়ী ও বাংলাবাজার স্কুলের মেয়েদের জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় নিয়ে আসার। তিনি কাজটি করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ছেলেরা দশজন করে এবং মেয়েরা চারজন করে বের হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড পার হয়ে এগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, প্রথমে ছাত্রদের দুটি দল মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। তৃতীয় দল নিয়ে বের হয় মেয়েরা। কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। টিয়ার গ্যাস ছোড়া হয়। তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। তারপরও গণপরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একদিকে ছিল পুলিশের হামলা, অন্যদিকে ছাত্ররা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেলের টুকরো ছুড়ছিল। তিনি বলেন, তাঁর মনে হয়েছিল তাঁরা বুঝি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। পরমুহূর্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শহিদ হন শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণকারী সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিলেন। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হলে তিনি বাড়ি ফেরেন।

ড. সুফিয়া আহমদ-এর স্মৃতিচারণায় স্পষ্টই বুঝা যায়, নারী হিসেবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা ভীত ছিলেন না। টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও গুলি মাথায় নিয়ে আন্দোলনকে সফল করার জন্য তাঁরা ছিলেন অবিচল। এই অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে নারী ইতিহাসের প্রথম সারির মানুষ।

ড. হালিমা খাতুন ছিলেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরই একজন। তাঁর স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন, ১৪৪ ধারা ভাঙা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছিল তাঁদের। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল মুসলিম গার্লস স্কুল এবং বাংলাবাজার গার্লস স্কুল থেকে মেয়েদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আসা। ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর দল ছিল মেয়েদের প্রথম দল। পুলিশ পথ আটকালে তাঁরা পুলিশের রাইফেল ঠেলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। তাঁরা বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে ঢাকা মেডিক্যালের ইমার্জেন্সি থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে আসেন এবং গণপরিষদ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেননি তাঁরা। শুরু হয় পুলিশের গুলিবর্ষণ। গুলিতে রফিকের মাথার খুলি উড়ে যায়। সেই রাতে রফিকের ছবির একটি ব্লক তৈরি করা হয়। ব্লকটি রাখা হয় সলিমুল্লাহ হলে, তাঁদের বন্ধু সাবেক অর্থমন্ত্রী

প্রয়াত শাহ কিবরিয়ার রুমে। পুলিশ হল তল্লাশি শুরু করলে সবাই সেখান থেকে সরে পড়েন। হল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ অবস্থায় রফিকের ছবির ব্লকটি নিয়ে আসার জন্য তাঁকে হলে পাঠানো হয়। তিনি বলেন, ভীষণ ঝুঁকির মুখে জীবন হাতে নিয়ে ব্লকটি উদ্ধার করেছিলাম। এখন পর্যন্ত রফিকের যে ছবিটি দেখা যায়, সেটি ওই ব্লক থেকে তৈরি।

নারীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের এটি আরেকটি ভিন্ন দিক। আন্দোলনের ভিন্ন মাত্রা বাড়িয়ে তোলায় নারীদের চেষ্টার কমতি ছিল না। তাঁরা ঝুঁকি নিয়েছিলেন জীবনের পরোয়া না করে। শহিদ রফিকের ছবি আজকে ইতিহাসের দলিল। এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি ধরে রেখেছিলেন একজন নারী।

রওশন আরা বাচ্চু সেদিনের স্মৃতিচারণায় বলেছেন, তিনি দেখতে পান ছাত্রদের দু'টো দল পুলিশের ব্যারিকেড টপকে চলে যায়। এরপরই তিনি অন্যদের নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁকে সামনে পেয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের আঘাত এসে পড়ে তাঁর ওপরে। তিনি পুলিশের এলোপাতাড়ি লাঠিপেটায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। গুলিবর্ষণ শুরু হলে রাস্তার পাশের একটি পুরোনো রিকশার গ্যারেজে লুকিয়ে থাকেন। অনেকক্ষণ সেখানে থেকে সন্ধ্যায় ছাত্রী হোস্টেলে ফিরে যান।

লক্ষণীয় যে, তিনজন নারীর স্মৃতিচারণায় বোঝা যায়, সেদিনের পরিস্থিতিতে তাঁরা রাস্তার রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের নানামুখী আক্রমণের শিকার হয়েছেন। নারী বলে পুলিশ তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেনি। কোনো ধরনের সৌজন্যমূলক আচরণ করেনি এবং এটি নির্মম সত্য, সেদিন তাঁদের কেউ শহিদ হয়ে যেতে পারতেন। হননি এটা নেহায়েতই একটি দৈব ঘটনা মাত্র। কিন্তু তাঁরা পরিস্থিতির ঝুঁকির সামনে ছিলেন।

সাহসী নারী নাদেরা বেগম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মেয়েদেরকে ভাষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। মিছিলে-মিটিংয়ে সক্রিয় ছিলেন।

মিছিলে গুলিবর্ষণের সময় গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। অধিবেশন চলাকালেই গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছায় সেখানে। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রথম দাবি উত্থাপন করেন এই বলে, আগে গুলিবর্ষণের তদন্ত হোক, তারপর অধিবেশন চলবে। গণপরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখেন। স্পিকার আবদুল করিমের সঙ্গে তীব্র ভাষায় তর্কবিতর্কের পর আনোয়ারা খাতুনসহ ৩৫ জন সদস্য পরিষদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। গণপরিষদ অধিবেশনেও নারীর পিছিয়ে থাকার অবমাননাকর ঘটনা সেদিন ঘটেনি।

একুশের প্রথম শহিদ ছিলেন রফিক। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। ঘটনার পর পরই এই ঐতিহাসিক দৃশ্যের ছবি তোলেন আমানুল হক, কাজী ইদ্রিস ও মেডিক্যাল ছাত্রী হালিমা খাতুনের সহযোগিতায়। সেদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতদের সেবা দিতে গিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন হাসপাতালের সেবিকা মেয়েরা। প্রতিরোধের জায়গাটি এভাবে তাদের সহযোগিতা, সমর্থনে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারা দেশে হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ পালিত হয়। যেসব নারী মিছিলে অংশ নিতে পারেননি তারা বাড়ির ছাদ থেকে ফুল ছিটিয়েছেন মিছিলের ওপর। এটিকে খুব স্বল্প পরিসরের আয়োজন বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। অনুপ্রেরণা প্রদানকারী ঘটনা হিসেবে মিছিলের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নারীরাই গ্রহণ করেছিলেন। স্মৃতিচারণায় অনেকে বলেন, রাতভর পোস্টার লিখেছেন নুরুন্নাহার কবিরসহ অনেক মেয়ে। ইতিহাসে তাঁদের নাম চাপা পড়ে গেছে। একজন নারীর কালো রঙের শাড়ি কেটে ব্যাজ বানানো হয়েছিল। তাঁকেও মনে রাখেনি কেউ। নারীরা নামের অপেক্ষায় কেউই ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন আন্দোলনের সাফল্য। চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদা।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম নির্মিত শহিদমিনারের বেদিতে নিজের গলার সোনার চেইন রেখেছিলেন সৈয়দা খাতুন (অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মাতা)। নিঃসন্দেহে ভাষা আন্দোলনের প্রতি এটি একটি প্রতীকী শ্রদ্ধা নিবেদন। অমর শহিদদের স্মরণ করার প্রতীক যেমন এটি, অন্যদিকে মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক সহযোগিতারও প্রতীক। নারীর এই দূরদৃষ্টি সবসময়ই জাগ্রত থাকে। ইতিহাসের বড়ো ঘটনায় এটি বারবারই প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও পুরুষ রচিত ইতিহাস নারীর প্রাপ্য মূল্যটি সঠিকভাবে দেয়নি। সমতার জায়গায় নারীর অবস্থান নির্ধারিত না হলে ইতিহাসের সত্যে ঘাটতি থাকে-এ কথা কাউকেই স্পষ্ট করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু নারীর ক্ষেত্রে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে।

এবার আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। একটি আসামের ভাষা আন্দোলনের কথা। ১৯৬০ সালে আসাম ভাষা আইন পাস হয়। এই আইনে অসমীয়া ভাষাকে আসামের রাজ্যভাষা করা হয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন এগারো জন। একজনের লাশ গুম করার জন্য পুলিশ পাশের পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের কর্মীরা সেই লাশ খুঁজে বের করে। এই আন্দোলনের পর আসাম সরকার ভাষা আইন সংশোধন করে এবং বরাক উপত্যকার জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা বহাল থাকে।

১৯ মে বরাক উপত্যকার শহিদ দিবস। যে এগারো জন শহিদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী। তার নাম কমলা ভট্টাচার্য।

পরবর্তী বিষয়টি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুল সালাম অমর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষীর দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁরা যে সংগঠনটি করেছিলেন তার নাম 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড।' এই দশজনের মধ্যে ছয়জন ছিলেন নারী।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন একজন নারী। তার নাম Anna Maria Mailof. তিনি বিষয়টিকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেন। রফিকুল ইসলামের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ করেন এবং রফিকুল ইসলামের টেলিফোন ও পত্রের উত্তর দিতে থাকেন। তার ধৈর্য, সহনশীলতা এবং বিবেচনা অনেক বেশি আন্তরিক ছিল একটি দিবসকে মাতৃভাষা দিবস করার পক্ষে। এমনকি হাঙ্গেরির ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশন, যে এই প্রস্তাবটি সমর্থন জানানোর প্রথম কমিশন, সে খবরটিও আনা মারিয়া রফিকুল ইসলামকে জানাতে ভোলেননি।

আনা রফিকুল ইসলামকে আরো জানিয়েছিলেন, এ রকম একটি প্রস্তাব যারা করছে, সে প্রস্তাবটি তাদের নিজ দেশের সরকারের কাছ থেকে আসতে হবে। সে অনুযায়ী রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের ইউনেস্কো কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সেসময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি কার্যকর করার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে যথাসময়ে পেশ করে। ইউনেস্কোর বোর্ড মিটিংয়ে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। ২৮টি সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব সমর্থন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সচেতন বিবেচনায় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাত্রা দেওয়ার জন্য ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন ছিল তাঁর শৈশবের সময়। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।' ২১ ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। পাঁচ বছর বয়সে যে শিশু এই স্লোগান উচ্চারণ করেছিল পরিণত বয়সে তাঁর হাতেই ভাষা দিবসটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে।

বলতে চাই, ঘর-রাস্তা-গণপরিষদ ছিল নারীর জন্য এক সফল বাস্তবতা। অন্যদিকে ভ্যাঙ্কুভার, প্যারিস এবং বাংলাদেশ সরকার প্রধানের অফিস ছিল নারীর জন্য আরেক সফল বাস্তবতা। সব জায়গায় নারী তাঁর পদক্ষেপটি দৃঢ়ভাবে ফেলেছেন।

লেখক : নন্দিত কথাসাহিত্যিক

একুশের দুপুর

জাকির আবু জাফর

পাতার শরীরে সাঁটা আমার ভাষার আশ্চর্য সৌরভ
ফুলের হৃদয়ে লেখা চিঠি
সেও আমার বাংলার আনন্দে দুলছে
তাকালেই তার গন্ধ মোহিত করে আমার গহীন গহন
আমার স্বপ্নের পাখিগুলো উড়াল তোলে বাংলার ঔদার্যে
পাঁপড়ির রঙগুলো আমার ভাষার রঙে সিক্ত
রোদের উষ্ণতা যেনো আমার অক্ষরের উত্তাপ
ছায়ার স্নিগ্ধতা তারই প্রশান্তির আরাম
আমার ভাষার গৌরবে দিনও রাত্রির উদ্বোধন
আহা খুন তুমি আমার ভাষার শরীরে রক্তজবার মতো
মিশে আছো চিরকাল
মিশে আছো পলাশের বুকের মতন
হৃদয়ের রঙগুলো মিশে গেলে
তুমি হয়ে ওঠো আশ্চর্য শিমুল
তুমি বায়ান্নের দুপুর হয়ে
কৃষ্ণচূড়ার মত রাঙা করে দিলে রাজপথের বুক
তারপর তুমি হলে রক্তাক্ত একুশ আমার বর্ণমালার দিন
একুশ আমার মাতৃভাষার দিন
একুশ এখন বিশ্ব ভাষার দিন
আকাশের নীলগুলো আমার চোখের বুকে নেমে এলে
দেখি নীল হয়ে ওঠো তুমি
এভাবে হঠাৎ মেঘের শহর থেকে ঝরো বৃষ্টির উৎসবে
আমার সমস্ত স্বপ্নের পাখি তোমার অশ্রুতে ভেজা
পাখা দোলালেই ঝরে পড়ে তোমার জল
এসব জলই রাত্রির শিশির হয়ে জমে থাকে ঘাসের শরীরে
পৃথিবীর সব কিছু তোমার আনন্দেই
জেগে ওঠে আমার ভেতর
তোমার ভেতর দেখি
জগতের সমস্ত রহস্যের মুখ
তুমি চিরদিন জেগে থাকো আমার মানচিত্র জুড়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

আবুল হোসেন আজাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে
ছাত্র জনতার মিছিল নামে পীচ ঢালা রাজপথে
হাতে প্যাকার্ড রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশ বায়ান্ন।
জিন্নাহ-র ঢাকার ঘোষণা
একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার মতো ফুঁসে উঠল বাংলা
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।
সেদিনের দৃপ্তকণ্ঠের স্লোগান মিছিল
ভূমিকম্পের মতো কেঁপে গেল শাসকের তখতে তাউস
আহত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হিংস্রতায়
পুলিশ চালাল গুলি উত্তাল জনসমুদ্রের মিছিলে।
রক্তে ভেসে গেল কাঠফাটা দুপুরের তপ্ত রাজপথ
মায়ের মুখের ভাষার জন্যে ওরা দিয়ে গেল প্রাণ
রফিক-শফিক-সালাম-বরকত-জব্বার
পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হলো
একটি ভাষার অনন্য উপাখ্যান।

রক্তমাখা কৃষ্ণচূড়া

কনক চৌধুরী

প্রভাত সীমান্তের দিকে তাকিয়ে আছি
আলো ফোটার সময় বুঝি হয়।
মাতৃভাষার ফাঁসির ঘোষণা আমি কোনদিন মেনে নিতে পারি না,
পারি না চোখের সামনে আমার ৫০টি অক্ষরের এমন মৃত্যু
প্রয়োজনে আমি জীবন দিব ফাঁসির মঞ্চে।
না না না- এ ঘোষণার সাথে কানো আপোষ নেই
ওরে কে কে রক্ত দিবি অপেক্ষায়, আয় চলে-
এ রক্তমূল্যে টগর-বকুল কামিনী-কৃষ্ণচূড়া আবার ও নামেই ফুটবে
বাংলাতেই দিবে শিস দোয়েল-শ্যামা
বউ কথা কও, চোখ গেল ওরাও ডেকে যাবে বাংলায়
আমিও হাসব বাংলায়, কাঁদব বাংলায়।
ফেব্রুয়ারি ২১ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।
মানি না, মানবো না, আমার মা, আমার ভাষা, আ-মরি বাংলা ভাষা!
হঠাৎই গুলির শব্দ-
গুলিবিদ্ধ ভাইয়েরা আমার,
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর মাটি রক্তে রক্তে সয়লাব ভ্রম হয় যেন,
আমার অক্ষরেরা রক্তমাখা কৃষ্ণচূড়ার বিছানায় জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।
এমন শোকের দিনে যে শোক করতে নেই
এমন সুখের দিনে যে কাঁদতে নেই
ওরা আজ রক্তমূল্যে বাংলাকে বহাল রাখে
সেই সাক্ষী হয়ে থাকে মেডিক্যাল চত্বরের একখণ্ড মাটি
আর হয়ে থাকে সেই মাটির এক চিলতে আকাশ
আমি আমার রক্তমাখা ২১ অনন্তের কোলে তুলে যাদুঘরে রেখে দেব।
আ-মরি বলব-
সেই তো আমার রক্তমাখা মাতৃভাষার ইতিহাস
সে তো বাঙালির এক গৌরবমাখা ইতিহাস।

শহিদমিনার তোমাকে সালাম

বিমল কৃষ্ণ রায়

শহিদমিনার নির্বাক দাঁড়িয়ে আছ/ মুক্তির প্রতীক অতন্দ্র প্রহরী।
উনসত্তর থেকে একাত্তর,/ স্বাধীনতা, বিজয় দিবস,
সংগ্রামী চেতনা,/ সমগ্র অর্জন;
তোমার শক্তির ছোঁয়ায় পেয়েছে/ গন্তব্যের সঠিক ঠিকানা।
শহিদমিনার, তুমি কালের সাক্ষী,/ তুমি ইতিহাস, তুমি দিনবদলের
অঙ্গীকার, দুরন্ত আহ্বান।
ফালগুনের আট, তেরশ' আটান্ন/ অমর একুশ উনিশশ' বায়ান্নে
রাজপথে রক্তের আলপনা এঁকে/ সালাম, জব্বার, রফিক, শিমুল, পলাশ
কিংবা কৃষ্ণচূড়া হয়ে যায়।
দাউদাউ জ্বলে ওঠে সমগ্র স্বদেশ/ বর্ণমালার জন্য, ভাষার জন্য।
ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে চায়/ শব্দসৈনিকেরা, ফাঁসির দাবি নিয়ে আসে
প্রতিবাদী কবিতা ও গানে অবিরাম।
এ প্রান্তথেকে ও প্রান্তে,/ রাজপথ, শহর-বন্দর-গ্রাম একাকার
বিক্ষোভে কাঁপে দেশ।
প্রতিষ্ঠা পায় মায়ের ভাষা,/ আজও তাই একুশে ফেব্রুয়ারি
মানুষের ঢল নামে,/ অসীম শ্রদ্ধায় হেঁটে যায় নগ্ন পায়ে
মুখে থাকে শোকের সংগীত;/ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতেপারি?
ছেলে হারা শত/ মায়ের অশ্রু গড়ায়ে এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?'
চতুর্দিক স্মৃতির মিছিল, শোকের মিছিল,/ শোকের মিছিলে ভাসে,
শহিদের মুখ, উচ্চারিত হয়/ বাংলা বর্ণমালা অ, আ, ক, খ,
ফুলে ফুলে ভরে যায় মিনারের বেদী।
শহিদমিনার, নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা/ শক্তির প্রতীক, তোমাকে সালাম।

অমর একুশে এক অবিনাশী চেতনা

মো. নূরুল হক

একটি ভাষা, একটি জাতি, একটি দেশ, সাড়ে ষোলো কোটি জনতার অনুভবের সুনীল আকাশের ২১ ধ্রুবতারা যাকে না দেখে অন্য তারা দেখা যায় না অথবা ইতিহাস পরিক্রমায় যাকে ছাড়া বাংলা সংস্কৃতির অরুণোদয় হয়নি বা হবেও না কখনো। কালে কালে, যুগে যুগে শোষিত, পেষিত আমরা যতবার প্রাণ দিয়েছি, যতভাবে প্রতিবাদী হয়েছি, একুশের চেতনা দিয়েছে অনুপ্রেরণা, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার সৎ সাহস। সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরোডটাসের সর্বপ্রথম উপলব্ধি ছিল, সংখ্যা থেকে বিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তি। আমাদের পরিচয়,জাতীয়তা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে সেই বাহান্নর ২১ তারিখের উপর। আমাদের অস্তিত্বের ঘ্রাণে মিশে আছে অমর বাংলাদেশের চিরঞ্জীব ফেব্রুয়ারি।

ঢাকা মেডিক্যালের আমতলায় সমাবেশ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখতে পাই যে, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উর্দু ভাষাটি কিছুসংখ্যক মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় নেতা দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উর্দু একটি ইন্দো- আর্য ভাষা যা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীরর মধ্যে প্রচলিত ছিল।এ ভাষাটি আবার ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এ ভাষাটি ফার্সি,আরবি এবং তুর্কির ঘনিষ্ঠ প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দিল্লী সুলতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বিকশিত হয়।

তখন থেকেই পারসিক-আরবি লিপির কারণে উর্দুকে ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। বিপরীতক্রমে হিন্দি ও দেবনাগরী লিপিকে হিন্দুধর্মের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হত।

ক্রমেই উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে উর্দু ভাষা জনপ্রিয়তা লাভ করে কিন্তু বৃটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ ছিল বাংলা যেখানকার মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে তাদের প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল।

বাংলা ভাষার সমর্থকরা ভারত ভাগের পূর্বেই উর্দুর বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে বাংলার সভ্যরা উর্দুকে ভারতের মুসলিমদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মনোনয়নের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।

এরপর উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তখন থেকেই আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা বিস্তার ও অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

একদিকে বাংলা ভাষার সারল্য ও প্রাঞ্জলতার কারণে পূর্ব প্রদেশের জনগণের বাংলা ভাষার প্রতি অতি দূর্বলতা অপরদিকে বাংলা ভাষার বিপক্ষে অবিভক্ত ভারতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের অনমনীয় অবস্থানের পরিণতিতে জন্ম হয় ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনের।

পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে দেশের মানুষকে তার মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশন স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসে।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লগ্নের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড.জিয়াউদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। পূর্ববঙ্গ হতে ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন।১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।বাঙালি সংসদ সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংযুক্তির দাবী জানালে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলায় অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ(১১-১৫ মার্চ, ১৯৪৮)। প্রতিবাদ ও ক্ষীণ আন্দোলনের মাঝেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একই বছরের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তার দাম্ভিক বক্তব্যে ঘোষণা দেন, But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan.

এ স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়ে উঠে ও জাগ্রত হয় আপামর জনতা। ক্রমান্বয়ে শাসকচক্রের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলার শক্তি সংঘবদ্ধ হতে থাকে।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে মুসলিম লীগের এক জনসভায় তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা দেন,

" উর্দু,একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" ।

এ ঘোষণার পর পুরো বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মহামারি আকারে। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, বুদ্ধি জীবী সকলেই ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।পাকিস্তান সরকার দমননীতি চালাতে থাকলে আন্দোলন প্রকট থেকে প্রকটতর আকার ধারণ করে। সভা, সমিতি, মিছিল ও শ্লোগানে সারা দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', ' মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়া চলবে না' প্রভৃতি শ্লোগান, ব্যানার, মিছিলে সারাদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

তারপরের ঘটনা সকল বাংলাভাষীদের মনে অমর শোকগাঁথা হয়ে ক্ষয়িষ্ণু গ্রোতের মত অবিরাম এক ভয়াল অতীত বহন করে চলেছে যা কিনা কোন রুপকথাকেও হার মানায়।

নির্ভিক বাঙালি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবীতে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলাদেশে ধর্মঘট আহবান করে।কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলায় ১৪৪ ধারা জারি করে সকল প্রকার সভা- সমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেয়।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং কিছু রাজনৈতিক কর্মী সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে শুরু

ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

হয় পুলিশের গুলি বর্ষণ ও লাঠিচার্জ। নিরস্ত্র ছাত্রসমাজ পুলিশের সশস্ত্র হামলার ব্যুহে ' রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ বাতাস।ক্রুদ্ধ স্বৈরাচারী শাসকদলের লেলিয়ে দেয়া পুলিশবাহিনী মিছিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে রাজপথ রঞ্জিত করল রক্তে রক্তে।চিরদিনের জন্য নিথর হয়ে গেল রফিক,শফিক, সালাম,বরকত,শফিউর,জব্বারসহ নাম না জানা অসংখ্য মানুষ। কালের নির্মম এ হত্যাকান্ডে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়।কিন্তু শোকের পাথরে বাঙালী মুহ্যমান হলেও ভাষা বিদ্রোহ দমে যায়নি বরং তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সর্বস্তরের জনগণ আন্দোলনে শরীক হয়ে দেশকে অচল করে দেয়।অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার অবশেষে ১৯৫৪ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।

আমরা ফিরে পেয়েছি ভাষা,ভাষা থেকে পেয়েছি স্বাধীনতা, স্বাধীনতা থেকে দেশ। মানচিত্রে মহিমান্বিত দেশপ্রেমিকদের রক্ততিলকের আল্পনা।ভাষা শহীদদের আত্মবলিদানের প্রতিটি রক্তফোঁটা হতে তৈরি হয়েছে ভাষা প্রহরী।এই বাংলায় প্রতিটি মানুষই আজ ভাষা সৈনিক! রফিক, শফিক, সালামেরা জীবন দিয়ে যে ভাষা দান করে গেছে,জীবন বাজি রেখে আজও বাংলার কৃতি সন্তানেরা অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে জাগ্রত চেতনায় এ ভাষাকে পরাশক্তির কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত রেখে বিশ্বদরবারে তার মান বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।তার প্রমান হিসেবে বিশ্ববাসী দেখেছে ১৯৯৮ সালে কানাডার ভ্যানকুভার প্রবাসী দুই বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে আবেদন জানান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য।উদ্যোক্তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর প্যারিস অধিবেশনে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয় যাতে বলা হয়, 21st February is proclaimed International Mother Language Day throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this day in 1952.

বিজয়ের জাতি হিসেবে বাঙালী বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর মানুষের কাছে সম্মানিত হল আরও একবার।কেননা,দিবসটি সকল দেশের মাতৃভাষার লালন,পরিচর্যা ও নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধির জন্য মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলার দিন।তাই ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমুহ প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করে আসছে এবং ২০১১ সাল থেকে জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

একুশের অবিনাশী চেতনা বুকে ধারণ করে আমরা পেয়েছি স্বাধিকার অর্জনের প্রেরণা ,৫৪ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়, পেয়েছি ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১ এ চূড়ান্ত বিজয়।

ভাষাশহীদদের রক্তগাঁথা গৌরবময় ইতিহাসকে চিরজাগ্রত করে রাখতে রচিত হয়েছে অসংখ্য সাহিত্য। অমর অবদান রেখেছেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুল লতিফ, মুনীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবুল ফজল, শামসুর রহমান অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার। আজ নবীন সাহিত্য বলতে যা বুঝি তাতেও মহান একুশে চেতনারই প্রতিফলন। ভাবগাম্ভীর্য ও আনুষঙ্গিক বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস উদযাপনের পাশাপাশি একুশে বইমেলা,বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার, একুশে পদক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সারাদেশ মহান একুশকে চিরভাস্বর করে রেখেছে।

অমর একুশের তাৎপর্য সমুন্নত রাখতে ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট হাইকোর্ট আটদফা নির্দেশনা সম্বলিত যে রায় দেয় তার সর্বশেষ দফাতে বলা হয়েছে,সব রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জীবিত ভাষা সৈনিকদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং সাধ্যমত তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

ছয় নম্বর দফায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে একটি লাইব্রেরি ও একটি ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

একুশ তাই শুধুমাত্র সাহিত্য,নাটক,কল্পনায় নয়,একুশ মানে সার্বভৌম বাংলাদেশ,বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু।

আলো ফোটার আগে একুশের ভোরে বারবার, বারবার,প্রতিবার কবি আল মাহমুদের মত বলতে চাই-

প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরি
আমায় নেবে সঙ্গে
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সোমবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-পিআইডি

ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক তাৎপর্য

রণেশ মৈত্র

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর থেকেই অর্থাৎ ঊষাকাল থেকেই আমাদের শিশুরা, তরুণ-তরুণীরা ক্রমান্বয়েই যেন অধিকতর সংখ্যায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি', ভাষা সৈনিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত গানটি সমবেত কণ্ঠে গাইতে গাইতে আজও প্রভাতফেরি করে গ্রাম, শহর, নগর, বন্দরের নানা পথ বেয়ে, অবশেষে শহিদমিনারে গিয়ে পুষ্পমাল্য বা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে চলেছে। এভাবে বাঙালি জাতির গর্বিত ওই দিনটিতে ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের অসীম আত্মত্যাগকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে; শ্রদ্ধা নিবেদন করছে সব শহিদ আত্মার প্রতি পরম শ্রদ্ধাভরে ওই শহিদমিনারেই এক মিনিটকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এবং অতঃপর সমবেতভাবে শপথ গ্রহণ করছে ভাষা আন্দোলনের সুমহান আদর্শকে বাস্তব জীবনের সব ক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য।

এই প্রভাতফেরি, এই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, এ শ্রদ্ধা নিবেদন বা এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুধু শিশুরা বা কিশোর-কিশোরীই করে থাকে তা বললে পূর্ণাঙ্গ সত্য বলা হবে না। সব পেশাজীবী মানুষ, নানা পেশাজীবী সংগঠনের ব্যানারে, ঘোর সাম্প্রদায়িক গুটি কতক দল ব্যতিরেকে সব রাজনৈতিক দল, ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠন, সব সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরের এ কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করে আসছেন আজ ষাটটি বছর ধরে। কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো বিরতিও নেই। এই দীর্ঘ সময়ে বহু সামরিক শাসন এসেছে। স্বৈরশাসক এসেছেন কিন্তু তাদের রক্তচক্ষু, সামরিক আইনের নির্দেশাবলী, ধর্মের নামে নানা ফতোয়া কোনো কিছুই জনগণকে বিরত করতে পারেনি একুশকে স্বাগত জানানোর এই মহান কর্মসূচি থেকে। বরং ওই স্বৈরশাসকরা পিছিয়েছে, ফতোয়াবাজরা হার মেনেছে, বিজয়ী হয়েছে জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ সব ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে।

কিন্তু এ তো গেল অনেকাংশই আবেগাপ্লুত কর্মসূচি অনেকটা যা দিনে দিনে বেশ কিছুটা যেন আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব হয়ে উঠছে তাবৎ স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা সত্ত্বেও। কারণ ওই পবিত্র শহিদমিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতে সমবেত কণ্ঠে এবং শত সহস্র হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরে যে শপথবাক্য উচ্চারণ করে থাকি, পরক্ষণেই সেই শপথগুলোকে ভুলে যেতে আমাদের মনে সামান্যতম দ্বিধার সঞ্চার হয় না।

এক এক করে বিষয়গুলো তুলে ধরে প্রকৃত অবস্থাটা আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকা ও সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

এক. ওই শহিদমিনার চত্বরে দাঁড়িয়ে যে আন্দোলনের শহিদদের ও সংগ্রামীদের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম সেই ভাষা আন্দোলনের শহিদদের এবং ভাষা সংগ্রামীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ পর্যন্ত কোনো সরকার বা বেসরকারি কোনো সংগঠন এগিয়ে আসেননি। ফলে এ বিষয়টি দিনে দিনে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত পাতাগুলো ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, তার গেজেট প্রকাশ প্রভৃতির ব্যাপারে সরকার থেকে শুরু করে নানা মহলের যে ব্যাপক তৎপরতা এক একটি সরকার পরিবর্তনের সঙ্গেই লক্ষ করে থাকি এ ব্যাপারে যে উৎসাহ-উদ্যম পরিলক্ষিত হতে দেখি ভাষা সংগ্রামীদের তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে আজতক কোনো মহলের সামান্যতম উদ্যোগ পরিলক্ষিত হতে দেখি না। এ বিষয়টি কি তবে অপ্রয়োজনীয়। ভাষা আন্দোলন কি তবে গুরুত্বহীন বা তার প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই? যদি না থাকে তবে তা কেন নেই? আর যদি থেকে থাকে তবে তাকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না কেন?

দুই. বাংলা একাডেমি-রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেরই অন্যতম ফসল। সেই বাংলা একাডেমি আজ থেকে বহু বছর আগে যখন ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বইমেলা অনুষ্ঠানের প্রচলন করল এবং সরকার যখন 'একুশে পদক' প্রতিবছর প্রদানের প্রথার প্রবর্তন ঘটালো সব মহল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ কাজ দুটির গুরুত্ব অসীম এবং ভাষায় তা প্রকাশের সামর্থ্য আমার নেই।

তারপরও যা লক্ষ্য করছি তাতে যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছি না তা প্রকাশের ইচ্ছেটাকে একইভাবে দমনও করে রাখতে পারছি না। একুশে পদক প্রদান যেমনই ভালো একটি উদ্যোগ, তেমনই আবার এ পদক যাতে যথার্থ ব্যক্তিরা পান এবং পদক যাদের প্রদান করা হবে তা যেন সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকে।

কার্যত দেখা যাচ্ছে দু'ধরনের বিতর্ক একুশে পদক নিয়ে ইতোমধ্যেই উঠেছে। এক. ঢাকার বাইরে অবস্থানকারী বিপুলসংখ্যক ভাষা সংগ্রামী আজতক একুশে পদকে ভূষিত হননি

হঠাৎ দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে ভাষা আন্দোলন ঢাকার বাইরে কোথাও হয়নি এবং সে কারণে ঢাকার বাইরে ভাষা সংগ্রামী থাকার কোনো কারণ নেই। অথবা পদক পাওয়ার অধিকারী হতে তাকে ঢাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং ঢাকাতে আন্দোলন করতে হবে।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনের যে কোনো ইতিহাস পাঠেই জানা যায় (যদিও কোনো একটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ নয়) যে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে অনেকে আহত হন, অনেকে আবার কারারুদ্ধ হন, অনেকে আত্মগোপনে লুকিয়ে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এদের সংখ্যা, বিশেষ করে এ আন্দোলনের নেতা-সংগঠকদের সংখ্যা কম করে হলেও হাজার তিনেক হবে। বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। এদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা মরণোত্তর পদক পেতে যথার্থই অধিকারী। আর যারা বেঁচে আছেন তারা কেন বাদ যাচ্ছেন পদক প্রাপ্তির তালিকা থেকে?

এর একটিই কারণ, আজতক ভাষা সংগ্রামীদের কোনো তালিকা প্রণীত হয়নি এবং ভাষা সংগ্রামী বলতে শুধুই যেন আবদুল মতিন, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, শেখ মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ সুলতান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকেই (বা আরো হাতেগোনা ৫/১০ জনকে বোঝায়)। তাদের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়নি । শুধু তাদের একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। কারণ এতে বোঝা যায় তারা যেন আন্দোলনকে ঢাকার মধ্যেই সীমিত রেখেছিলেন এবং ঢাকার বাইরে একে প্রসারিত করতে পারেননি।

দুই. আর একটি মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশ কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছে একুশে পদক-যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি শুধু তাই নয়, আদর্শগতভাবেও যারা ভাষা আন্দোলন বিরোধী। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এর জন্য আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং তৈলমর্দনের অভ্যাস দায়ী। আমার দৃঢ় ধারণা এ বিতর্কগুলি এড়ানোর একটি মাত্র পথই খোলা আছে- ভাষা সংগ্রামীদের (১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের) তালিকা প্রণয়ন করা এবং সেই তালিকা অনুযায়ী সবার পদক প্রদান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও গুণীজনদের এ পদক প্রদান স্থগিত রাখা। বিষয়টি সরকার বিশেষভাবে ভেবে দেখলে আনন্দিত হব।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যে প্রধান কারণ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ও তার লক্ষ্যসমূহের বিশাল ব্যাঘাত ঘটে। তা শুধু আর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যেমন-ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের সমাধিস্থ হতে দেখলাম তেমনি তা থেকে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত সমাজের চিন্তা-চেতনাও বিকশিত হয়। সব সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্ব ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়, অন্তত জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলনের মাধ্যমে। পরিণতিস্বরূপ, প্রথমত অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের সগৌরব আত্মপ্রকাশ, মুসলিম ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ধীরে ধীরে 'মুসলিম' শব্দ অপসারণ, নতুন করে কোনো সাম্প্রদায়িক বা ধর্মের নামে কোনো দল বা সংগঠনের জন্ম না হওয়া, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে 'ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান' এর বদলে 'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' সন্নিবেশিত করার দাবি প্রভৃতি। ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি জাতির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে জনমত চূড়ান্তভাবে সংগঠিত হওয়া। এগুলো সবই বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্তভাবে বিকশিত হওয়ার তাৎপর্য।

তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে বাঙালি সংস্কৃতির নিত্য নতুন বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, আলপনা, মেয়েদের কপালে টিপ, বিয়ের অনুষ্ঠানমালা, কুলা চালন প্রভৃতির প্রচলন, সংগীত-নৃত্য, অঙ্কনশিল্প বাঙালির সংস্কৃতি জগতে এক নতুন ধারার প্রবল আত্মপ্রকাশ ঘটায়। বাংলা নাটক, কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, সংবাদপত্রসমূহের নামকরণ, বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড প্রভৃতি এতে নতুন মাত্রার সঞ্চার করে। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন আমাদের জীবনে, চিন্তায়, মননে ব্যাপকভাবে ঘটে যায়।

কিন্তু তার স্বাভাবিক এবং চূড়ান্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আজও আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সর্বত্র মাতৃভাষা বাংলায় প্রচলন হয়নি। সর্বোচ্চ আদালতের রায়, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন এখনো বাংলাতে হচ্ছে না আইনশাস্ত্রের পুস্তকসমূহ বাংলা ভাষায় অনুদিত না হওয়ার কারণে।

অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আজো প্রবর্তিত হয়নি বা তা প্রবর্তনের পথে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হতেও আজতক দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই যেমন দেখা যাচ্ছে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা, তেমনি ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হচ্ছে ধনীর সন্তানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি আর রয়েছে আরবির মাধ্যমে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই নানা সার্ভিস, অর্থাৎ প্রশাসনিক, পুলিশসহ অপরাপর বিশেষায়িত সার্ভিসে সহসা নিয়োগ পাচ্ছেন। অপরপক্ষে ধর্মের নামে আরবি শিক্ষার দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়া মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী জীবনে প্রধানত বেকারত্বকেই আলিঙ্গন করে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতে হচ্ছে। এ এক দুঃসহ জীবন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রচলনের বিষয়টি এখনো কাগজে-কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিবিধ অস্তিত্ব কার্যত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা ও আদর্শের সঙ্গে এর কার্যতর কোনো মিলই নেই। তাই এর অবসান সূচিত করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তিই হবে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, তার দ্রুত প্রচলন অত্যন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষার মানের আন্তর্জাতিকীকরণও অপরিহার্য এ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পৃথিবীতে।

বাংলা একাডেমি পৃথিবীর নানা ভাষা থেকে শ্রেণি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্রের বই বাংলায় অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ইংরেজি ও অপর দু'তিনটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করে বাংলালিপি ও সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারে তেমনি পারে বিশ্ব সাহিত্যের সাথে বাঙালির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাতে। তদুপরি প্রকৌশল, কৃষি, মেডিকেল, আইন প্রভৃতি শাস্ত্রের বই বাংলায় অনুবাদের কাজও দ্রুততর করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক তাৎপর্য বাঙালির সামগ্রিক জীবনধারায় কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে হলে এর বিকল্প নেই।

লেখক : সাংবাদিক ও কলাম লেখক।

একুশে বইমেলার ই-তথ্য কেন্দ্র

মো. শাহেদুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র ফুটপাত ধরে বইমেলার দিকে যেতে যেতে দৃষ্টিতে পড়ল দুটি বড়ো আকারের প্রজেক্টর। সেখানে কিছুটা সময় থমকে দাঁড়াতেই পর পর ভেসে উঠল আমাদের গৌরবোজ্জ্বল তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলো। তারপর ধাপে ধাপে ভেসে উঠতে লাগল সম্প্রতি মেলায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপনও।

প্রযুক্তির এমনই ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন মেলায় প্রবেশ করছে হাজার হাজার পাঠক, দর্শনার্থী। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলা প্রাঙ্গণের মূল প্রবেশপথ দিয়ে একটু বাঁয়ে এগুলেই বিশাল একটি আমগাছ। এখানেই বসেছে ই-তথ্য কেন্দ্রের একটি স্টল। স্থাপত্যশৈলীর নান্দনিক ছোঁয়ার এ স্টল থেকে মুহূর্তের মধ্যেই পাঠক জেনে যাচ্ছেন মেলার কোথায় কোন স্টল। অনেকে আবার ই-তথ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করছেন প্রিয় লেখকের নতুন কী কী বই প্রকাশিত হলো তার খবরাখবর জানতে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রজেক্টের অধীনে ই-তথ্যকেন্দ্রের দুপাশে রয়েছে দুটি টাচস্ক্রিন মনিটর। এই মনিটরের মাধ্যমে মেলায় আগত দর্শনার্থীরা নির্দিষ্ট প্রকাশনী বা প্রিয় লেখকের কোন বই মেলায় এসেছে, কোন বই আসার অপেক্ষায় বা যে-কোনো প্রকাশনী, বই ও লেখক সম্পর্কে তথ্য জানতে পারছেন। বাংলা একাডেমির উপপরিচালক (সমন্বয় ও জনসংযোগ) বলেন, এবারের একুশে বইমেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে প্রযুক্তির ছোঁয়া, যাতে শুধু পাঠকরাই উপকৃত হচ্ছেন না উপকৃত হচ্ছেন প্রকাশকরাও। কারণ অতিদ্রুতই তারা নিজেদের বইয়ের হালনাগাদ তথ্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে পারছেন। প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে ভাষাচিত্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার সোহেল বলেন, বইমেলায় ক্রেতা ও পাঠকের সুবিধার জন্য বেড়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। এতে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা উপকৃত হচ্ছেন, সুফল পাচ্ছেন লেখক-প্রকাশকরাও। চারটি অভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মেলার সর্বশেষ খবর জানতে পারছেন পাঠক। বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট www.banglaacademy.com, আরো রয়েছে www.ekusheyboimela.com, www.lekhok.net, www.21gronthomela.com এছাড়া বই বিক্রির ওয়েবসাইট www.boi-mela.com থেকেও বইমেলার সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এর বাইরে এবারেই প্রথম বইমেলা প্রাঙ্গণকে পরিণত করা হয়েছে ওয়াই-ফাই জোনে। ফলে অনলাইনে বইমেলা থেকেও যুক্ত হতে পারছেন সবাই।

মেলা শব্দটি শুনলেই কানে ভেসে আসে হইহুল্লোড়। বাঙালির প্রাণের উৎসব অমর একুশে বইমেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও শুরু হয়েছে বইমেলা। তবে সময়ের সাথে সাথে সর্বত্র যে প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে, তার থেকে বাদ পড়েনি এবারের বইমেলাও। নানাভাবেই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবারের বইমেলা। এরমধ্যে রয়েছে বইমেলার ই-তথ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বই, অনলাইনে বই বেচাকেনার সুযোগ প্রভৃতি। এর মাধ্যমে বইমেলা যেন পেয়েছে ভিন্ন এক রূপ। অংকুর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মেজবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বই কেনার সুযোগ রয়েছে অনেকগুলো স্টলেই। সব ক্ষেত্রেই ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার যেভাবে বেড়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই বইমেলাতেও কার্ডের মাধ্যমে বই কেনার সুযোগ রেখেছেন। এতে করে বইমেলাতে নগদ অর্থ বহনের ঝামেলা কমে গেছে বলেই মন্তব্য করেছেন আগত বইপ্রেমীরা।

প্রযুক্তির নান্দনিকতার ছোঁয়ায় এবারের একুশের বইমেলা কেমন লাগছে জানতে চাইলে কবি ও সাংবাদিক কবির হুমায়ুন বলেন, সত্যিই অভূতপূর্ব। ফেসবুক হলো বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সেবা এবং ওয়েবসাইট যেটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজনকে পরস্পরের সাথে আন্তঃসংযুক্ত হতে, পারস্পরিক আগ্রহগুলিকে ভাগাভাগি করতে এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রুপে অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। এ ফেসবুকের মাধ্যমেই ২০১৭ সালে লেখা হয়েছে কবি সরকার আমিনের আত্মজীবনীমূলক একটি বই। যার নাম *জীবনের মাছগুলি*। এ গ্রন্থের লেখাগুলো সরকার আমিন যখন ফেসবুকে লিখেছিলেন তখন এর পাঠকও ছিল তার ফেসবুক বন্ধুরাই। এমনকি গ্রন্থটি যে প্রকাশনা সংস্থা নন্দিতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই প্রকাশকও ফেসবুকেই এ গ্রন্থের লেখাগুলো পড়ে গ্রন্থটি প্রকাশে উৎসাহিত হন। গ্রন্থটি এরই মধ্যে প্রকাশিতও হয়েছে। সরকার আমিন ফেসবুকের মাধ্যমে ওইদিন সন্ধ্যায় সাইবার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার অফিস কক্ষে। নির্দিষ্ট সময়ে একে একে সাইবার বন্ধুরা হাজির হতে থাকলে বিস্ময় শুরু হয়। ধারণা করা হয়েছিল হয়ত ৮-১০ জন আসবেন। কিন্তু সে সংখ্যা যখন ৫০ ছাড়িয়ে যেতে থাকল সবারই বিস্ময় প্রকাশ করার পালা। এই সাইবার বন্ধুরাই প্রথম ফেসবুকে লেখাগুলো পড়ে নানা মন্তব্য আর মতামতে মুখর করেছিলেন। আবার এখন তারাই প্রকাশ পাওয়া গ্রন্থটি নিয়েও আলোচনা-আড্ডায় মেতে উঠবেন। অর্থাৎ আমাদের প্রকাশনা, লেখা প্রকাশ এবং লেখক-পাঠকের ধরন ও সম্পর্ক আগের যে-কোনো ধারণাকে পালটে দিয়েছে। সবকিছু এখন প্রকাশ্য ও অনেক বেশি জীবন্ত।

বরাবরই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু দেশের সংস্কৃতি জগতের সবচেয়ে বড়ো আয়োজন অমর একুশে বইমেলা। দেশের সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্পের প্রধান অবলম্বন মাসব্যাপী এই বইমেলা। জাতির মেধা ও মননের প্রতীক বলে খ্যাত বাংলা একাডেমি চত্বরে আয়োজিত এই মেলাকে কেন্দ্র করেই মূলত সৃজন ও মননশীল বইয়ের সারা বছরের প্রকাশনা ও বিপণনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। মেলার শুরু থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশের গ্রন্থানুরাগীদের যে বিপুল সমাগম ঘটে থাকে, এককথায় তা অনন্য। গ্রন্থানুরাগের সঙ্গে একুশের চেতনার মেলবন্ধনে এই মেলাটিকে এদেশের মানুষ গ্রহণ করেছে প্রাণের মেলা হিসেবে। বাংলা একাডেমির সদস্য সচিব বলেন, এবারের বইমেলা শুরু হচ্ছে একটু স্বাতন্ত্র্য। মেলাটিকে কেবল প্রকাশকদের মেলায় পরিণত করে তুলতে সচেষ্ট বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ। এবার মেলায় অংশ নিচ্ছে ৭২৬টি বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সরকারি প্রতিষ্ঠান ২৯টি এবং সেবামূলক সংস্থার স্টল ৬৩টি। শিশুদের জন্য রয়েছে ১১৯টি প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮১৮টি এবং স্টলের সংখ্যা ১৬০২টি। মেলার বাইরের সড়কে কোনো স্টল থাকবে না। মেলার অভ্যন্তরে কোনো এনজিও বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

বইমেলা পরিভ্রমণ শেষে বেশ কয়েকদিন পর বইমেলাটা ভালো লাগার হয়ে উঠল আজ। বসন্তের হাওয়া দোল দিচ্ছে মেলায়। দু'চারটি প্রজাপতি উড়ে উড়ে যাচ্ছে একাডেমির আঙিনার ফুল বাগানের গাছের উপর দিয়ে। যা দেখে বিস্ময়মাখা দুটি চোখে ধাঁধা লাগিয়ে গেল যেন মেলায় আসা ছোট্ট টুকটুকে মেয়েটির। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল-কী সুন্দর, কী অপরূপ। বইমেলায় লাল পোশাক পরিহিত মানুষটি বাঁশি বাজাচ্ছেন প্রতিদিন। তার বাঁশির সুরে যেন আনন্দ ঝরে পড়ছে। এভাবেই সবকিছু একদিন আনন্দময় হয়ে উঠবে আমাদের দেশ।

লেখক: সাংবাদিক ও আইনজীবী

লক্ষ বীনার সুর

বাতেন বাহার

যারা-যতই উড়ুক আকাশ পাড়ে
সবশেষে তো আবার মাটির ধারে
আসতেই হয়, এ স্বাভাবিক নীতি
কারণ, মাটি মায়ের পরিচিতি।

মায়ের কথা-মায়ের হাসি গান
ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অভিধান!
অভিধানে শ্রেষ্ঠ মায়ের ভাষা
পুষ্ট যাতে মনের যত আশা।

আশায় প্রিয় শপথ রাঙা দিন
সুখের সাথে শান্তি অমলিন।
অমলিন যে ভালোবাসা মার
ভালো মন্দ-সবই আপন তার।

আপনমনে ঋদ্ধ মায়ের ভাষা
যার মাঝে সুখ, স্বপন কাঁদা হাসা
সে ভাষা আজ লক্ষ বীনার সুর
যার খ্যাতি ছোঁয়-দূর থেকে ও দূর।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা বর্ণমালা

দুলাল সরকার

গাঁয়ের বৃহৎ বট গাছটার নিচে সুবৃহৎ আলোটা ধরে
বিলে যাবার উদাস পথ যেতে যেতে দেখি
তলায় বসে একমনে ময়লা কাপড় পরে হাতে বেত
সামনে গাঁয়ের কিছু অপুষ্ট ছেলে মেয়ে ছেঁড়া জামা-প্যান্ট
একমনে পড়াচ্ছেন অ, আ, ক,খ,গ,ঘ
ইত্যাদি বাংলা বর্ণমালার প্রথম ভাগ... আর তিনি
পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে কাগজে-কলমে কী যেন লিখে চলছেন;
সাহস করে কাছে গিয়ে দেখি তিনি লিখে চলছেন বর্ণ পরিচয়
শিশুতোষ পুস্তক, সহাস্যে বললেন দেখ
কি উজ্জ্বল অসামান্য দেহ সৌষ্ঠব, নিখুঁত স্থাপত্যের
চিহ্নময় বাংলা অক্ষরের শরীর কী জাদুময় ছন্দ
গতিশীল নদী, মেঘের আলপনা, পাহাড়ের গাম্ভীর্য
ও সামুদ্রিক অতলতা নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ
কোথাও ঘুঘুর ডাক, চিত্রময় মেঘল আয়ুধ ;
আমি খুঁজি অক্ষরের জন্ম পরিচয় ,প্রাকৃত হৃদয়
গঙ্গা,যমুনা ধৌত পলি জমাটির গন্ধ, আঁকাবাকা শস্যের পথ
অপরুপ বাংলার,বাংলা অক্ষরের দেহরূপ –
বললেন, হরপ্পা লিপির থেকে উৎসারিত ব্রাহ্মী লিপিতে যুক্ত
এই দেহ ব্রাত্য জনের তুমি তারই সন্তান,
অতল আকর্ষণ হেতু রক্ত দিয়ে তুমি এর রেখেছ সম্মান
দিয়েছে পতাকা,স্বাধীন স্বদেশ ভূমি মায়ের মতন
অক্ষরের হাত ধরে জাতীয় চেতনা বিশ্ব চেতনায় যুক্ত
একদিন বাংলা অক্ষর দেবে জীবনের উজ্জ্বল সন্ধান।

একুশ আসে

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

একুশ আসে ফাগুন মাসে
শিমুল পলাশ শাখায় হাসে।
একুশ আসে বইয়ের মেলায়
আরো আসে মেঘের ভেলায়।
একুশ আসে স্মৃতি নিয়ে
শহিদ ভাইয়ের প্রীতি নিয়ে।
একুশ আসে কৃষ্ণচূড়ায়
বাংলা ভাষায় মনটা জুড়ায়।
একুশ আসে ফুলের শাখায়
বঙ্গ হিয়ায় আবির মাখায়।
একুশ আসে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

চেতনায় ভাস্বর কল্পনা

অসিত কুমার মণ্ডল

পৃথিবীর পথে
একুশ যেন জীবনের সন্ধান।
প্রগত আত্মার অন্তর্গত বিলাপ
রক্তের অক্ষরে জেগে ওঠে যেন–
পুঞ্জীভূত বর্ণমালার বিদগ্ধ গান।
জীবনের চলা–
একুশ যেন দিয়েছে দূর্বার গতি।
উদ্ধত–উচ্ছ্বাসে তাই লিখি;
চেতনায় ভাস্বর কল্পনাগুলো যেন
উত্থান হ'য়ে বিকশিতে চায় জ্যোতি।
যতবার আসে–
স্মৃতির মণিকোঠায় বেজে ওঠে বাঁশি।
অমূর্ত, অনাগত মুহূর্তের প্রতীক্ষায়;
লোহিত সূর্যের সুদীপ্ত শিখা যেন–
বলে ওঠে: একুশ আমি বাংলাকে ভালোবাসি।
মালা নিয়ে যাই–
অমরাত্মার স্মৃতি ফলকের পাশে।
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, আবেগ কম্পিত মালা
মীনার চূড়ায় পরাই যেন সজল চোখে;
নগ্ন পায়ে দাঁড়িয়ে শিশির ভেজা ঘাসে।

আট-ই ফাগুন

মুহাম্মদ ইসমাঈল

একুশ মানে আটই ফাগুন
ইংরেজিটা না বলি
যুদ্ধ করলাম বাংলার জন্য
বরকত সালাম নাম স্মরি।
ফাগুন মাসে আগুন মেখে
রক্তে শিমুল সাজ করে
এই ফাগুনে শহিদমিনার
ফুলে ফুলে যায় ভরে।
মায়ের বুলি দিচ্ছে তুলে
চাই হারানো শোকগুলি
বায়ান্নতে ভাইয়ের বুকে
খান সেনারা দেয় গুলি।
ভাষার মাসে বর্ণমালা
বীর শহিদের নাম স্মরি
একুশ গেলে সব চেতনা
কিন্তু কেন যায় মরি।

ঘুড়ি

সোহরাব পাশা

ঘুড়ি বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। বিনোদনের নির্মল আনন্দ আছে ঘুড়ি উড়ানো উৎসবে। সংস্কৃতির মূলধারার সাথে এর সম্পর্ক গভীর। মন খারাপের দিনগুলো আনন্দে ভরিয়ে দেয় এ উৎসব। সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধন আছে ঘুড়ি উৎসবে। 'ঘুড়ি' বা 'ঘুড্ডি'-র আভিধানিক অর্থ সুতার সাহায্যে আকাশে উড়াবার কাগজের খেলনা বিশেষ।

বাংলাদেশ একখণ্ড সবুজের আনন্দবাড়ি। এদেশের মানুষ বড়ো ভালোবাসে দেশটাকে। শত্রু এলে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে বুক উঁচিয়ে প্রতিবাদ করে। 'রক্তলাল সবুজ বুকে হেঁটে যায় সাহস/হাসে বাংলাদেশ'। গ্রামবাংলার যে তরুণ একাত্তরে 'জয়বাংলা' বলে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল গ্রেনেড, যে আঙুলে গর্জে উঠেছিল রাইফেল এলএমজি, এসএল আর শৈশবে সোনারোদ সকালে সেই আঙুল ছুঁয়েছে প্রজাপতির রঙিন ডানা। চৈত্র-বৈশাখে দুপুরের প্রখর রোদে দৌড়ে গেছে মার্বেল, গুলতি আর ঘুড়ির পেছনে। হাতের নাটাই থেকে ডোর ছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেছে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে। কখনো নদী সাঁতরিয়ে কাশবন থেকে কুড়িয়ে এনেছে ঘুড়ি। কখনো বা দূর গাঁয়ের শিমুল, পলাশ, বট-পাকুড়ের মগডালে উঠে নিয়ে এসেছে ডোর ছেঁড়া ঘুড়ি। রাত করে ঘুড়ি নিয়ে ফিরেছে বাড়ি।

চৈত্র মাসের প্রথম থেকে ঘুড়ি বানানো শুরু হতো। হরেকরকম ঘুড়ির পেছনে উড়ছে দুরন্ত শৈশব। চিলেঘুড়ি, প্রজাপতি, লণ্ঠন, জাপানি, ঝাঁপি, পালকি, ছৈ, চং, চিল্লা, পতেঙা তেলেঙা ইত্যাদি বাহারি ডাকনাম ছিল ঘুড়ির। অনেক নামের সাথে ঘুড়ির আকৃতির মিল রয়েছে। 'চিলেঘুড়ি' চিলের আকৃতির। 'প্রজাপতি' ঘুড়ি ছিল প্রজাপতির নান্দনিক রঙিন ডানার মতো দেখতে। চিলে ও লণ্ঠন ঘুড়িও ছিল বেশ দৃষ্টিনন্দন। লণ্ঠন ঘুড়ি নানা রকমের হতো। কোনোটির ছোটো ছোটো পাঁচটি অংশ থাকত। দেখতে খানিকটা অ্যারোপ্লেনের মতো। পাখার প্রথম, তৃতীয় এবং শেষ অংশ রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ানো থাকত এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশ খোলা রাখা হতো। নাটাইয়ের সুঁতো ছেড়ে দিয়ে ফের গুটিয়ে নিলে বন্ধ অংশে বাতাস লেগে তরতর করে ওপরে ওঠে যেত লণ্ঠন ঘুড়ি। প্রজাপতি ঘুড়ি নানা রঙের কাগজ দিয়ে রংধনুর মতো রাঙানো থাকত। মনে হতো ডোর ছাড়াই উড়ে যাবে আকাশে। নৌকার ছৈয়ের মতো 'ছৈ' ঘুড়ি আর বাঁশের তৈরি দরজার মতো করে বানানো হতো ঝাঁপি ও চং ঘুড়ি। খুব সহজেই তৈরি করা যেত। বড়ো সাইজের বাঁশপাতা কাগজের ওপর বাঁশ অথবা গাছের ডাল খুব চিকন করে কেটে ধনুকের মতো বাঁকা করে আঠা দিয়ে লাগানো হতো বেষ্টনি, যাতে সরে না যায় এজন্য চার বা তিন কোনা করে রঙিন কাগজ কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া থাকত। বিন্নিধানের চালের গুঁড়ো, জিগার কষ, বল্লাগোটা অথবা সেদ্ধ করা ললিতা গোলআলু আঠা হিসেবে ব্যবহার করার চল ছিল। কেউ ওসব জোগাড় করতে না পারলে ভাত কিংবা বার্লি দিয়ে আঠার কাজ চালাতো।

বারুণী অষ্টমী বৈশাখি মেলা ছাড়াও ঘুড়ি উড়ানো উৎসব ছিল। ঘুড়ির সুঁতো কাটাকাটি আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত পাঁচ গাঁয়ের মানুষ। দু'তিনশ গজ সুতো প্যাঁচানো থাকত নাটাইয়ে। ইচ্ছে মতো ছেড়ে বা টেনে সুতো কাটাকাটি খেলা চলত। খোলা মাঠে রঙিন কাপড় টানিয়ে মাদুর পেতে রাখা হতো দর্শকদের জন্য। পাশে থাকত ছোটো ছোটো দোকানে পাওয়া যেত কদমা, বাতাসা, ঝুরি, ফুট খৈ, নৈ টানা ও পান সুপারি।

হৈ হুল্লোড়, আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হতো চারদিক। যারা একটু অল্পবয়েসি ওদের ঘুড়ি উড়ানো ছিল আরো মজার। ওরা শুধু তেলেঙা ঘুড়ি উড়াতে পারত। ওদের সুঁতো নাটাই থাকত না। কলাগাছের বাকল বা খোল থেকে আঁশ বের করে গিঁট দিয়ে ডোর বানাতো। ছোটো ছোটো তেলেঙা ঘুড়ি উড়িয়ে দৌড়াতো সারা মাঠ। সে দৃশ্য ছিল চোখ জুড়ানো নির্মল আনন্দের।

সময় বদলে গেছে। বদলে গেছে ঘুড়ি উড়ানো সেই সোনালি দুপুর। ওই তেলেঙা ঘুড়ি ছাড়া একে একে সব ঘুড়ি প্রায় হারিয়ে গেছে ধূসর নীলিমায়। বেড়ে গেছে মানুষজন। চৈত্র-বৈশাখের রোদেলা দুপুরে ঘুড়ি উড়ানোর সেই বিস্তৃত খোলা মাঠ আর নেই। সে মাঠ এখন আলবাঁধা ছোটো ছোটো বোরো ক্ষেত। সারারাত গভীর নলকূপ দিয়ে কলকল করে উপচে পড়ে জল। অল্প দূরে দূরে জ্বলে বৈদ্যুতিক বাল্ব। বোশেখি হাওয়ায় দুলে ওঠা ওই আলোকে মনে হয় হঠাৎ মেঘ ছুঁয়ে যাওয়া নক্ষত্র-আকাশ। হাওয়ার দুলুনিতে নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠছে। মেঘলা দিনে মনে হয় মিটমিট করে জ্বলছে জোনাকির আলো। চৈত্রের সেই ধুলো-ওড়া মাঠে এখন সকাল-দুপুরে পা ভিজে যায় বোরো ক্ষেতের উপচেপড়া ঠাণ্ডা জলে।

মানুষ কি ভুলে যাবে সেই ঘুড়ি উড়ানোর স্বপ্নরঙিন দিনগুলো? না, অষ্টমী কিংবা বোশেখি মেলায় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে বন্দরে ঘুড়ি উড়ানোর নির্মল আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে আজও লোকেরা। শত দুর্বিপাকে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে মানুষ। স্বপ্ন দেখে সমৃদ্ধ স্বর্ণসুন্দর আগামীর। আমাদের গ্রামবাংলার আবহমান ঐতিহ্যের অংশ এই ঘুড়ি উৎসবে আজ মানুষের মনে জাগায় তারুণ্যের উদ্দীপনা। ঘুড়ির মতোই এক-একজন হয়ে ওঠে মুক্তিপিপাসু স্বপ্নবাজ তরুণ। আশাবাদী মানুষেরা স্বপ্ন দেখে, চিরদিন স্বপ্ন দেখুক, তারুণ্যের ডানা মেলে ছুঁয়ে দিক ঘুড়ির আকাশ, অন্তহীন বাসনার প্রশস্ত উঠোন। স্বপ্নজয়ের দেশ এই বাংলাদেশ। এদেশের কিশোর-তরুণ যে হাতে ঘুড়ি উড়ায় শূন্য নীলিমায়, মেতে ওঠে বিপুল আনন্দে, আবার শত্রু এলে এ দেশটাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দেয় অবলীলায়। এদেশের মানুষের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই দেশ। সে কারণেই বিভিন্ন মৌসুমে, পার্বণে জেগে ওঠে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ।

বাঙালির চেতনার রঙে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল), ১৬ ডিসেম্বর। বাঙালি ছেঁড়া-ঝরা পাতার মতো অলস নয়, তাদের হৃদয় চিরসবুজ, দুলে ওঠে, জেগে ওঠে। দেশমাতৃকার ভালোবাসা বড়ো সরল-অবুঝ। এদেশের কিশোর-তরুণ কেবল মাঠে মাঠে কিংবা শহরের চিলেকোঠা থেকে ঘুড়ি উড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে না, ওদের আছে ল্যাপটপ-কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তির বিশ্ব ওদের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশ এগিয়ে যায়, ফুটবল, ক্রিকেটে নানা ক্রীড়া নৈপুণ্যে। বাংলাদেশকে কেউ আর 'দাবিয়ে রাখতে' পারবে না। বাংলাদেশ বার বার স্বপ্নকে জয় করে আনন্দে মেতে ওঠে, জেগে ওঠে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ঈশ্বরদি কলেজ

মাতৃভাষা
খান চমন-ই-এলাহি

মাটির মতো, আকাশের মতো
সত্য আমার মা।
পতাকার মতো, দেশের মতো
সত্য আমার বাবা।
যুদ্ধের মতো, শান্তির মতো
সত্য আমার স্বাধীনতা।
স্বপ্নের মতো, সত্যের মতো
চিরকালের মাতৃভাষা।

ফাগুনে আগুন ছড়ায়
চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

ফাগুন এলে আগুন ছড়ায়, বুকের মাঝে
রঙে রঙে শহিদমিনার, তাইতো সাজে।
নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরি, হয় সকালে
আজো স্মৃতি বহন করে, কালে কালে।
বর্ণমালা আনলো ফিরে, বাহান্নতে
রক্ত ঝরে দামাল ছেলের, রাজপথে।

মেঘভাঙা পাহাড়ি জ্যোৎস্নায়
আতিক আজিজ

পাহাড়ি জ্যোৎস্নার খসে
খসে নাকি সমস্ত আড়াল! দূরে
টিলায় ছড়িয়ে সঙ্গীদল, আমরা দুজন
কালো পাথরের নুড়ি খুঁজতে শালের ছায়ায়
মিশে যাই, মেঘভাঙা পাহাড়ি জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে
অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যে যেন শালের মঞ্জরি খোলে
খুলে যায় শরীরে শরীর, গান
আমাদের ব্যক্তিগত সব উচ্ছলতা
হয়ত দেখার ছল
জ্যোৎস্নায় হাওয়া খেতে ভেসে আসে
ভেসে আসে লোকালয় সাঁওতালী মাদলে, আমরা
আবার শরীরে টানি পুরনো অভ্যাসে ওই কাপাসের ভার-
অথচ পাহাড়ি জ্যোৎস্না
খুলেও পারে না খুলতে আড়ালের ভেতর আড়াল।

গরবিনী হে দেশমাতৃকা
মনসুর জোয়ারদার

সূর্যের মতোই তুমি চেয়েছিলে রইবে স্বাধীনতা
আপন সত্তায় তাই আগুনের শিখা জ্বেলেছিলে
যতক্ষণ না দেহের প্রতি রক্তকণা
বিজয়ী সেনানী করে পরিতৃপ্ত হলে।
দেখেছি কি ভয়ংকর তোমার নন্দিত অবয়ব,
কি উত্তাপ ছড়িয়েছো প্রশান্ত হৃদয়ে
জ্বালিয়েছো কি আগুন স্বপ্নিল আঁখিতে
নিয়ে এলে কি ঝংকার মধুর ভাষায়;
রেখেছি আপন মনে ঘটনার স্তর একে একে!
এখন তোমার স্বপ্ন করেছি যে স্বপ্ন আমাদের
গর্বোদীপ্ত ইতিহাস সে তো আমাদের ইতিহাস,
রয়েছে কালের ভাঁজে যতো নির্মম নখরাঘাত
আয় তাতে দেবো না বিক্ষত হতে তোমার ভূমিকর;
কোটি কোটি বংগল শার্দুল আমরণ থাকবো জেগে
শুধুই তোমার জন্যে গরবিনী হে দেশমাতৃকা।

বিমূর্ত ভাবনা
মতিন বৈরাগী

ভালোবাসা উড়ে গেলো ভ্রমণের পথে পথে
যেতে যেতে ঝরে গেলো লোককুঞ্জ লোকান্তরে
তোমার হৃদয় থেকে হৃদি ছুঁয়ে ঝরাপাতা রেণূ হয়ে আসে
প্রকাশ আঁকুতি ডালে ডালে পাখির ডানায়
শিশিরের মতো টলটল পূত ও পবিত্র জল দেবতার অঞ্জলি
আকাশ মেলায় চাঁদালোক হয়ে রয়ে যায় শ্যামল আঁচলে
রোদে রোদে রোদ নেই প্রতিটি প্রভাত মুখ বোজা খড়খড়ে
শীতে বুঝি ফেটে গেছে কেউ
ভালোবাসা মরে যায় কোনও এক পথে কোনও একদিন
একার একাকী একা দুটো বৃক্ষমাঝে প্রকাশের রেখা ক্ষমাহীন
তারা বলে মরে গেছে, মরে গেছে-
চেয়েছিল যেতে বুঝি দূরে বহু দূর
পাতা ঝরে আখড়ার ঢোল বাজে করতাল বাজে চৈত্রদুপুর
চোখে ছিল আশা, খঞ্জনা পাখির মতো একা
স্বপ্নের সড়ক ভেঙে উদ্বেল হাওয়া
থেমে আছে এইখানে হিম হিম হয়ে
কলাই তৃণের মুখে দুফোঁটা জল অশ্রু অবিকল
অনাদী জমিনে বয়ে যায় তবু মেলেনা সংবাদ
পোষ্টকার্ড ছেঁড়া
ছিঁড়াফাঁড়া সব লেখাজোখা হয়েছে বিলীন।

বর্ণমালার প্রেমে
মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

পূর্ণিমায় ভরা জোছনার মতো লেগেছে তাঁরেই ভালো
অগাধ কিছু পূর্ণতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলো
হিংসুকেরা হিংসা করে পরের ভালো দেখে
নিন্দুকেরা নিন্দা করে শরীরে নিন্দা মেখে।
ফাগুনের আগুন ঝরা দিনের মতো করে
কথা বলে যায় কোটি বাঙালি স্বপ্ন বুকে ধরে
কথা বলে যায় কোকিল-টিয়া
কথা বলে যায় জুঁই-পাপিয়া
কথা বলে যায় মেঘ ;
কথা বলে যায় পলাশ-শিমুল
কথা বলে যায় কৃষ্ণচূড়া ফুল
হৃদয়ে মেখে আবেগ।
কথা বলে যায় মটরশুঁটি
কথা বলে যায় পাতা
কথা বলে যায় ফাগুনের দিন
পূর্ণ করে খাতা।
এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণ, অস্থিমজ্জা
এই বর্ণমালা বাঙালির ধ্বনি পুষ্পসজ্জা
এই বর্ণমালায় আঁকা হয় কোটি বাঙালির সোনালি স্বপ্ন
এই বর্ণমালায় ফিরে আসে মধুমাস, সুখের লগ্ন।
বর্ণমালা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ফাগুন মাস
বর্ণমালা আমার মায়ের বুকের খোকা হারা সর্বনাশ
বর্ণমালা আমার বিজয়ী বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
বর্ণমালা আমার লাল হয়ে যাওয়া নীল লোহিত সাগর।
এই দিগ্বিজয়ী বর্ণমালা আমার কোমল প্রাণ
শ্যামলা গাঁয়ের মেঠো পথে পেয়েছি তাঁরই ঘ্রাণ
নদীর ওপারে মেঘলা আকাশ হঠাতেই যায় থেমে
আমি কখন যেন পড়ে গেছি বর্ণমালার প্রেমে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

ড. তিমির মজুমদার

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে সাংবিধানিকভাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে জাতিসংঘের ৬১তম অধিবেসনে 'The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous people বা 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র' জারি হবার পর, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিরা হঠাৎ করেই নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মিডিয়ার একাংশ, সুশীল সমাজের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ ও আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাদের এই দাবি দিনের পর দিন আরো জোরালো হচ্ছে। তাদের এই দাবির প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি ও স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিবেচনা করেই এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

মাতৃভাষায় বই পেল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীরা

আদিবাসী বলতে কি বুঝায়? এর সংজ্ঞা কী? যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার এবরিজিন, নিউজিল্যান্ডের মাউরি, রাশিয়ার মেনেট, জাপানের আইনু, ফ্রান্স ও স্পেনে বাসকু, দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা ও মায়া, আরবের বেদুইন প্রভৃতি জনগোষ্ঠী যারা প্রাচীন কাল থেকে স্ব স্ব ভূখণ্ডে বসবাস করেছেন তারা আদিবাসী হিসেবে বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত ও সুপরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিয়ানগণ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করলে তাদের অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। আভিধানিক সংজ্ঞায় আদিবাসী শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Indigenous' অথবা 'Aborigine' যার অর্থ হচ্ছে 'Native Born, Originating or Produced Naturally in a Country, not Improved' অথবা 'Belonging to a Particular place rather than, coming to it from somewhere else' যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ' দেশি', স্বদেশজাত, দেশীয়; বৈদেশিক অথবা বহিরাগত নয়। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় 'আদিবাসী' হচ্ছে কোনো স্থানে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি, বসতি স্থাপন, ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা যায়নি। (The Indigenous are the group of human race who have been residing in a place from time immemorial. They are the true sons of the soil: Morgan, An Introduction to Anthropology, 1972)। এখন দেখা যাক জাতিসংঘ উপজাতি ও আদিবাসীর সংজ্ঞা কীভাবে নির্ধারণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labor Organization-ILO)-এর ৫ জুন ১৯৫৭ তারিখের ৪০তম অধিবেশনের কনভেশন ১০৭ এবং ৭ জুন ১৯৮৯ তারিখের কনভেশন ১৬৯-এ আদিবাসী ও উপজাতির সংজ্ঞা এবং এর সাথে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সংযোজন করা হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের ১৩ সেপ্টেম্বের ২০০৭ তারিখে ৬১তম অধিবেশনের 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র' যার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে সেটিতে উপজাতিদের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই এবং আদিবাসীদের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হয়নি।

ক। Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957(No. 107) Article 1: This Convention Applies to:

(১) Members of tribal or semi-tribal populations in independent countries whose social and economic condition are at a less advanced stage than the stage reached by the other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customers or traditions or by special laws or regulations. (অর্থাৎ একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অন্যান্যদের চেয়ে অনগ্রসর এবং যারা তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আইন অথবা বিশেষ আইন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত তাদেরকে উপজাতি অথবা উপ-উপজাতি বলে গণ্য হবে)।

(২) Members of tribal or semi-tribal populations in independent countries which are regards as indigenous on account of their descent from the populations which in habited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization and which, irrespective of their legal stats, live more in conformity with the social, economic and cultural institutions of that time than with the institutions of the nation to which they belong. (অর্থাৎ যে সকল

জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত হওয়া অথবা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করছে এবং যারা তাদের কিছু বা সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে তারা আদিবাসী বলে গণ্য হবে)।

খ। Indigenous and Tribal Population Convention, 1989 (No. 169) Article 1: The Convention Applies to:

(a) Tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially be their own customs or traditions or by special laws or regulations. (অর্থাৎ একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে, ভিন্নতর যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও আইন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত তারা উপজাতি বলে গণ্য হবে।

(১) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. (অর্থাৎ যে সকল জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত হওয়া অথবা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করছে এবং যারা তাদের কিছু বা সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে তারা আদিবাসী বলে গণ্য হবে)।

উপরোল্লিখিত দুটি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক উপজাতি ও আদিবাসী সংজ্ঞার মূল পার্থক্য হচ্ছে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত হওয়ার বা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করা। বাকি শর্তগুলো মোটামুটি একই। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠী উপজাতি অথবা আদিবাসী হবেন উপরোক্ত শর্তের ভিত্তিতে। আইএলও'র এই সংজ্ঞাটি যদি বাংলাদেশে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের ক্ষেত্রে বিচার করা হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এরা আদিবাসী নয়; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপজাতি। এখন পর্যবেক্ষণ করা যাক বাংলাদেশের জন্য ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনের 'United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples' বা 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র'টি কতটা প্রযোজ্য ঘোষণাপত্রটির উদ্দেশ্যে মহৎ হলেও এটি অনেক ক্ষেত্রে সংগতিপূর্ণ নয় এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এর গ্রহণযোগত্যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ। এই ঘোষণাপত্রের নিম্নোক্ত ধারাগুলো বিশেষভাবে অধ্যায়ন করা প্রয়োজন।

Article 3

Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right' they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা তাদের মর্যাদা নির্ধারণ করতে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারবে।

Article 4

Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as, ways and means for financing their autonomous functions. অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার চর্চার বেলায় তাদের অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বায়ত্ব শাসন বা শাসিত সরকারের অধিকার থাকবে এবং তাদের স্ব-শাসনের কার্যাবলির জন্য অর্থায়নের পন্থা ও উৎসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অধিকার থাকবে।

Article 5

Indigenous people have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their right to participate fully, if they so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State. অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী যদি পছন্দ করে তাহলে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার রেখে নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, আইনি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা ও শক্তিশালীকরণের অধিকার থাকবে।

Article 10

Indigenous peoples not be forcibly removed from their lands or territories. অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি বা ভূখণ্ড থেকে জোর করে অন্য কোথাও সরানো যাবে না।

Article 30

Military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous peoples, unless justified by relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous peoples concerned. অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি কিংবা ভূখণ্ডে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত উপযুক্ত জনস্বার্থের প্রয়োজনে যুক্তিগ্রাহ্য হবে অথবা যদি সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সম্মতিজ্ঞাপন বা অনুরোধ করে।

জাতিসংঘের সনদগুলোর বর্তমান অবস্থা কী? Indigenous and Tribal Populations Convention-1957 (No. 107) ১৯৫৭ সালে পাস হলেও এ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২৭টি দেশ এই কনভেনশনটি র‍্যাটিফাই করেছে। ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশের কনভেনশন ১০৭ র‍্যাটিফাই করেছিল। পরবর্তীতে কনভেনশন ১৬৯ পাস হবার পর কনভেনশন ১০৭ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তামাদী হয়ে গেছে এবং অদ্যাবধি কনভেনশন ১৬৯ র‍্যাটিফাই করেনি বাংলাদেশ। তাই এটি বাংলাদেশের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়।

লক্ষণীয় যে, ইতোমধ্যে ৮টি দেশ এই কনভেনশনকে নিন্দা করে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্যদিকে Indigenous and Tribal Populations Convention 1989 (No. 169), ১৯৮৯ সালে পাস হলেও এখন পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২২টি দেশ এই কনভেনশনটি

র‍্যাটিফাই করেছে। এই উপমহাদেশের একমাত্র নেপাল ছাড়া আর কোনো দেশ এই কনভেনশনটি র‍্যাটিফাই করেনি। অন্যদিকে, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে জাতিসংঘের ৬১তম অধিবেশনে আদিবাসী বিষয়ক যে ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে ভোটদানের সময় ১৪৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে, ৪টি দেশ বিপক্ষে, ১১টি দেশ বিরত এবং ৩৪টি দেশ অনুপস্থিত থাকে। বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত থাকে। বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া দেশগুলো হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এই দেশগুলোতে আদিবাসীরাই ছিল এক সময়ে মূল জনগোষ্ঠী এবং জাতিগতভাবে যাদের সংখ্যা বিপদজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

বিস্ময়কর অথবা পরিহাসের ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের আদিবাসীদের রক্ষায় খুব সোচ্চার ও পৃষ্ঠপোষক দেশগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু নিজ দেশের জন্য আইএলও কনভেনশন ১০৭ বা ১৬৯ ও জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী নয়, পক্ষে ভোট দেয়নি এবং র‍্যাটিফাই করেনি। কাজেই তাদের কুমিরের অশ্রু বর্ষণের কারণ ও মতলব বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হবার প্রয়োজন নেই। এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলোর উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য এই মায়াকান্নার পেছনে মূলত ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি আধিপত্যবাদী স্বার্থই প্রকাশ্যে কিংবা অবচেতনে প্রবলভাবে কাজ করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংগ্রাইদের বিজু উৎসব

তাহলে বাংলাদেশে সত্যিকার আদিবাসী কারা? নিঃসন্দেহে বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষীরা এদেশের সত্যিকারের আদিবাসী। কারণ এরাই প্রোটো-অষ্ট্রেলিয়েড (Proto Astroloid) নামের আদি জনধারার অংশ এবং তারাই একমাত্র আদিবাসী বা Son of the Soil বলে দাবি করতে পারে। এর পেছনে জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশের এই অঞ্চলে বাঙালিরা বসবাস করে আসছে চার হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে বিক্রমপুর, ওয়ারি-বটেশ্বর, সোনারগাঁও কিংবা মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত নৃতাত্ত্বিক প্রমাণাদি এসব বিষয় নিশ্চিত করে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান উপজাতি চাকমাদের আদি বাসস্থান ছিল আরাকানে, ত্রিপুরাদের আদি বসবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং মার্মা জনগোষ্ঠী এসেছে বার্মা থেকে। সেই অর্থে তারা কেউই বাংলাদেশের আদিবাসী নয় বরং তারা এদেশে অভিবাসী। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে দেশান্তরী হয়ে এদেশের নানাস্থানে অভিবাসিত হয়ে আনুমানিক তিনশ থেকে পাঁচশ বৎসর পূর্ব থেকে বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাস করতে শুরু করেছে। তাই কোনোক্রমেই বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী হতে পারে না। যারা তাদের আদিবাসী বলে আখ্যায়িত করছেন তারা শুধু সংবিধান লঙ্ঘন করছেন তা নয় বরং তারা জেনে-শুনে মিথ্যাচার করছেন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো যে আদিবাসী নয় তার প্রমাণ কি?

বাংলাদেশের উপজাতীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো এদেশের আদিবাসী বা ভূমিপুত্র নয় তার প্রমাণ প্রখ্যাত উপজাতি গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদ Robert Henry Sneyd Hutchinson তার বই 'An Account of Chittagong Hill Tracts' (1906), Captain Thomas Herbart Lewin (1869) তার বই 'The Chittagong Hill Tracts and Dwellers There in' (1869) অমেরেন্দ্র লাল খিসা (১৯৯৬) প্রমুখের লেখা, ঘোষণাপত্র, থিসিস এবং রিপোর্ট বিশেষণে পাওয়া যায়। তারা সবাই একবাক্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের নিকট অতীতের কয়েক দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এদেশে স্থানান্তরিত বা অভিবাসিত হবার যুক্তি প্রমাণ ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক Captain Thomas Herbart Lewin এর মতে, 'A greater portion of the hill tribes, at present living in the Chittagong Hills, undoubtedly came about two generation ago from Arracan.

This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong Collectorate (Lewin 1869, 28) অর্থাৎ মাত্র দুই পুরুষ আগে ব্রিটিশদের সাথে বার্মা যুদ্ধের সময় চাকমারা পার্বত্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে যা চট্টগ্রাম কালেক্টরেট অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মারমা বা মগ জনগোষ্ঠী সদস্যরা ১৭৮৪ সনে এ স্থলে বার্মা থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস শুরু করে (Shelly, 1992 এবং Lewin, 1869)। বিশিষ্ট ব্রিটিশ চাকমা পণ্ডিত অমেরেন্দ্র লাল খিসা 'অরিজিনস অব চাকমা পিপলস অব হিলট্রেক্ট চিটাগং'-এ লিখেছেন, 'তারা (চাকমারা) এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে'। পরবর্তীতে আরাকান এবং মগ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ করেন। আড়াইশ থেকে তিনশ বছর পূর্বে তারা উত্তর দিকে রাঙামাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন'। এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবদুর রব, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম, বিজয় কী বোর্ডের উদ্ভাবক জনাব মোস্তফা জব্বার, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ করেছেন এমন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক জনাব মেহেদী হাসান পলাশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নয়। এছাড়া মার্মা সার্কেল চীফ অংশু প্রু চৌধুরী প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার এবং ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উপজাতি হিসেবে পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে 'আদিবাসী' হিসেবে নয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আদিবাসী আখ্যায়িত করলে অসুবিধা কী?

অনেকেই এটি বলতে শোনা যায় যে, আদিবাসী বললে যদি ওরা

নৃত্যরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুরা

খুশি হয় থাকে তাহলে সমস্যা কী? বিভিন্ন লেখা এবং দুই একটি সরকারি প্রজ্ঞাপণে এমনকি কোর্টের রায়ে পর্যন্ত অবচেতনভাবে তাদের আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এ থেকে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে হতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে 'ইস্ট তিমুর' কিংবা 'সাউথ সুদান'-এর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার দায়ভার নিতে কি আমাদের সেই সব বুদ্ধিজীবী এবং মিডিয়া প্রস্তুত আছেন? সকলের জ্ঞাতার্থে এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'ইস্ট তিমুর' কিংবা 'সাউথ সুদান'-এর মতো একই পরিস্থিতির কাশ্মীর, চেচনিয়া, ফিলিফাইনের মিন্দানাও এবং পৃথিবীর আরো কিছু স্থানে বিরাজ করলেও সেখানে গণভোট অনুষ্ঠিত করে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রদান করা হয়নি এবং হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাছাড়া স্বাধীনতার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি অংশ স্বাধীন 'জুম্মল্যান্ড' স্থাপন করার জন্য এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একান্ত চেষ্টায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হলেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একাংশ এখনও জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং জেএসএস (সংস্কার)-এর নামে তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম চালু রেখেছে। কাজেই 'আদিবাসী' স্বীকৃতি আদায় করতে পারলে জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী তারা 'জুম্মল্যান্ড' দাবি করবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

কেননা 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র' ২০০৭ অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করলে সেই অনুযায়ী তাদের স্বায়ত্বশাসন, রাজনৈতিক, আইনি, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা থাকবে। বিশেষ করে এই ঘোষণার ধারা ৩০ অনুযায়ী 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি কিংবা ভূখণ্ডে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত জনস্বার্থের প্রয়োজনে যুক্তিগ্রাহ্য হবে, অন্যথায় যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন বা অনুরোধ না করে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তার সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর ভূমি বা ভূখণ্ড ব্যবহারের আগে যথাযথ পদ্ধতি ও বিশেষ করে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশেষ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে অনুমতি গ্রহণ করার বিষয়টি সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আর যদি তারা 'সেচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন' না করে তাহলে কী হবে? যদি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বহির্বিশ্বের কারো সঙ্গে কোনো অশুভ আঁতাত করে? যদি বহির্বিশ্ব থেকে ওই স্থল আক্রান্ত হয় তবে সরকার কী সামরিক কার্যক্রম গ্রহণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কারো সম্মতির অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় থাকবে? যদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নেতৃত্ব সম্মতি না দেয় তাহলে কী হবে? বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ অথবা কোনো অঙ্গ সংগঠনের মত অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশে কম-বেশি ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব 'মালিকানাধীন' ভূমি আছে এবং তারা যদি সেই ভূমি বা ভূখণ্ড ব্যবহারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপর এত বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাহলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কী হবে? এই সকল প্রশ্নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সকলকে এই বিষয়টিতে সর্তক হতে হবে এবং 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'দের 'আদিবাসী' বলা বন্ধ করতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও প্রচুর চাকমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারা সেখানে Schedule Cast হিসেবে পরিচিত এবং সুবিধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেখানকার কোনো মিডিয়া কিংবা বুদ্ধিজীবীতো তাদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন করছে না। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা আমাদের মোট ভূখন্ডের দশ ভাগের একভাগ (১৩,২৯৫ বর্গ কিমি./৫,১৩৩ বর্গ মাইল) এবং এখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা এক ভাগ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১৫,৯৮,২৯১ জন) মানুষ বাস করে। এখানে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং বাকি অর্ধেক বাঙালি। মাত্র দশ বছর আগে থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের দাবিকৃত আদিবাসী হবার প্রবল ইচ্ছা আসলে জাতিসংঘের ২০০৭ সালের 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে'র বিভিন্ন ধারা থেকে ভবিষ্যতে ফায়দা লোটার কৌশল। এই কৌশলের ফাঁদে পা দেওয়া ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক। আশা করা যাচ্ছে যে, এই রচনা পাঠ করার পর আর কেউ স্বজ্ঞানে বা অবচেতনে বাংলাদেশে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'দের 'আদিবাসী' সম্বোধন করবেন না।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও উন্নয়ন কর্মী

শব্দদূষণের বিরূপ প্রভাব

মোস্তফা কামাল পাশা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। শব্দ কখনো সুন্দর, কখনো মধুর, কখনো সুরেলা কিংবা ছন্দময়। আবার শব্দ যে সবসময় মধুর হয় তাও নয়। সেটা কখন? শব্দ যখন মাত্রা অতিক্রম করে তখন। শব্দ তখন হয়ে ওঠে বিপত্তি বা আপত্তির কারণ। শুধু তাই নয়, অপরিকল্পিত এবং মাত্রাতিরিক্ত শব্দ মানুষের শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে ওঠে। এই মাত্রাতিরিক্ত শব্দকেই আমরা বলছি 'শব্দদূষণ'। অর্থাৎ আইনের ভাষায় বলতে গেলে শব্দের সহনীয় মানমাত্রা অতিক্রমকারী শব্দই 'শব্দদূষণ'।

নগরায়ণ, শিল্পায়ন, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যানবাহন, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে দূষণ সৃষ্টি হয়। আর অপরিকল্পিক ব্যবহার হয়ে থাকে অব্যবস্থাপনা, আইনি দুর্বলতা কিংবা আইনের প্রয়োগহীনতার কারণে। শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শব্দদূষণের কারণে মানুষের মাথা ধরা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, মনসংযোগ নষ্ট ও অনিদ্রাসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে শিশু ও বয়স্ক জনদের। বিশেষ করে গর্ভবতী মা এবং হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য উচ্চমাত্রার শব্দ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক ও শারীরিক সমস্যা তৈরি হয় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

আমাদের দেশে শব্দদূষণের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে বড়ো বড়ো শহরগুলোতে শব্দদূষণের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষ ক্রমাগতভাবে হয়ে উঠছে অসহিষ্ণু। প্রতিটি মানুষের আচরণ যেন মানবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে এক অভিনব নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে। মানুষের পারিবারিক জীবন ছাড়িয়ে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সামাজিক, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে। শব্দদূষণের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা যতখানি বিঘ্নিত হচ্ছে তা আর অন্য কোনোভাবে হচ্ছে না। অথচ স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝার উপায় নেই। শব্দদূষণ মানুষের মনোজগতে যে বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে তা নীরব ঘাতকের মতো নষ্ট করে দিচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষ এখনো এতটাই অসচেতন যে মানুষ তার কুফল বুঝতেই পারছে না। যে-কোনো মারাত্মক মহামারীর চেয়ে শব্দদূষণ এখন ঢাকাসহ সারাদেশের নীরব মহামারী।

মানুষের অসচেতনতা এবং অবহেলা শব্দদূষণের জন্য প্রধানত দায়ী। আইন প্রয়োগের দুর্বলতা ও জনসচেতনতার অভাবে শব্দদূষণ আজ মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় আইন আছে। কখনো কখনো সেটা প্রয়োগের দুর্বলতা, কখনো কখনো মানুষ আইন না জানার কারণে আইনের পরিপন্থি কাজ করা, আবার কারো কারো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা– এসব কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছি। শব্দদূষণ এমন একটি ব্যাপার যা আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই এটা যে অপরাধ বা অনুচিত কাজ সেটাই মনে করে না। তাই বিদ্যমান আইনটি জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচার করে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

শব্দদূষণ নিয়ে আলোচনার আগে আসলে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে কোন ধরনের শব্দকে আমরা দূষিত শব্দের আওতায় আনব বা কোন কোন শব্দ আসলে দূষণের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সহজ কথা মানমাত্রা অতিক্রমকারী শব্দের উৎসগুলো কী কী। শহর এলাকায় প্রধানত শব্দদূষণের প্রধান উৎস হচ্ছে গাড়ির হর্ন। তারপর আছে

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি

আবাসিক, অনাবাসিক ও শিল্প এলাকায় নির্মাণযন্ত্র ও নির্মাণ সামগ্রীর অপরিকল্পিত ব্যবহার। অপ্রয়োজনীয় মাইকের শব্দও কখনো কখনো মানমাত্রা অতিক্রম করে। যদিও নানা অজুহাতে তা ব্যবহার করার জন্য আইনি প্রক্রিয়া থাকলেও জনগণ তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে না।

এবার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আমাদের যে আইনটি আছে তার প্রতি একটু আলোকপাত করা যাক। এ আইনটির শিরোনাম হচ্ছে 'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬'। এ বিধিমালার আওতায় আমাদের এলাকাগুলোকে নীরব, আবাসিক, মিশ্র, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় শব্দের একটি নির্দিষ্ট মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আজ মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণের কারণে দেখা দিচ্ছে নানারকম সমস্যা।

'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬'-এর ৮(১) ধারায় বলা আছে, 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি মোটর, নৌ বা অন্য কোনো যানে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন ব্যবহার করিতে পারিবেন না'। ধারা ২(ব)-এর সংজ্ঞায় বলা আছে, 'হর্ন অর্থ উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী নিউম্যাটিক, হাইড্রোলিক বা মাল্টি টিউন্ড হর্ন'।

বিধিমালার ১১(১) ধারায় বলা আছে, 'আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ মিটারের মধ্যে উক্ত এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইট বা পাথর ভাঙার মেশিন ব্যবহার করা যাইবে না।' ১৪(১) ধারায় বলা আছে, 'কারখানার অভ্যন্তরে বা যন্ত্রপাতির নিকটে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে'। ১৫ ধারায় বলা আছে, 'কোনো এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বা বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন'।

এবার দেখা যাক বিধিতে শাস্তি সম্পর্কে কী বলা আছে। ১৮(২) ধারা মতে, 'কোনো ব্যক্তি এই আইনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন'।

এবার দেখা যাক আমাদের আইনে শব্দের সহনীয় মানমাত্রা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি যে, আমাদের আইনে বিভিন্ন এলাকাকে নীরব এলাকা, আবাসিক এলাকা, মিশ্র এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ও শিল্প এলাকা হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে নীরব এলাকায় দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবল। আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবল।

কিন্তু আমাদের সারাদেশের শহরগুলোতে শব্দের এই সহনীয় মানমাত্রার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শব্দ হচ্ছে যা যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ না করেও অবলীলায় বলা যায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক জরিপে বিভাগীয় শহরগুলোতে গড়ে সর্বোচ্চ ১৩৩ ডেসিবল থেকে সর্বনিম্ন ৪৭ ডেসিবল শব্দ পাওয়া গেছে। একটি বেসরকারি সংস্থা গত জানুয়ারি মাসে ঢাকা শহরের ৪৫টি স্থানে জরিপ করেছিল। এতে দেখা যায়, নীরব এলাকায় দিনের বেলা শব্দের মাত্রা মানমাত্রার চেয়ে দেড় থেকে দুইগুণ, আবাসিক এলাকায় দিনের বেলা শব্দের মাত্রা দেড়গুণ ও রাতে শব্দের মাত্রা দেড় থেকে প্রায় দুইগুণ, মিশ্র এলাকায় দিনে শব্দের মাত্রা দেড়গুণ ও রাতে শব্দের মাত্রা দেড় থেকে দুইগুণেরও বেশি। এছাড়া বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে শব্দের মাত্রা মানমাত্রার চেয়ে দেড়গুণ বেশি। নীরব এলাকায় দিনের বেলা শব্দের মাত্রা সবচেয়ে বেশি ইডেন মহিলা কলেজের সামনে, ১০৪.৪ ডেসিবল। মিশ্র এলাকায় দিনে শব্দের মাত্রা সবচেয়ে বেশি পল্টনে, ১০৫.৫ ডেসিবল। আর রাতে শব্দের মাত্রা সবচেয়ে বেশি কলাবাগানে, ১০৬.৪ ডেসিবল। অন্যদিকে বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে শব্দের মাত্রা সবচেয়ে বেশি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে, ১০৮.৯ ডেসিবল।

শব্দের এই আগ্রাসী উপদ্রব ঠেকাতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস পালনের মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৫টি টিভি স্পট নির্মাণ করে দেশের ১১টি টিভি চ্যানেলে বিতরণ করা হয়েছে প্রচারের জন্য। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ সব ক'টি চ্যানেল এ স্পটগুলো প্রচার করছে। বিভাগীয় শহরগুলোতে সচেতনতামূলক লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা মুদ্রণ করা হয়। কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে একটি ফ্লায়ার প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান এবং পরিবেশ মেলায় অধিদপ্তরের স্টল থেকে এটি বিতরণ করা হয়।

ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি স্থানে 'নীরব এলাকা' চিহ্নিত সাইনপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবসে মানিক মিয়া এভিনিউ ও মিরপুর সড়কের সংযোগস্থলে তৎকালীন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাইনপোস্ট উদ্‌বোধন করেন। চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ বিভাগে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, চালকদের প্রশিক্ষক, চালক এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর বিআরটিএ এবং পুলিশের মাঝে ২০০ সাউন্ড লেভেল মিটার, ১০টি অ্যাকুস্টিক ক্যালিব্রেটর, ৩০টি ট্রাইপড বিতরণ করেছে। সরকার এ কর্মসূচির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। আইনের যথযথ প্রয়োগ এবং জনগণের মধ্যে শব্দদূষণের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা-এই দুটি সমন্বিত উদ্যোগকেই সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে।

সরকারের এই উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যমান আইনের কঠিন প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের পাশাপাশি জনগণেরও এখন এগিয়ে আসা দরকার এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সরকারকে সহযোগিতা করে একটি শব্দদূষণমুক্ত শহর এবং দেশ গড়ে তোলার জন্য। হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু আমরা পারব।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সহিংসতা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

ছয় বছরের রোহিঙ্গা শিশু রহমত উল্লাহর কোমরের বাঁ পাশে গুলি ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। রহমতের মতো শরীরে গুলি নিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে ছটপট করছে পাঁচ শিশু। রহমতের বাড়ি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু এলাকায়। বাবা হাফিজ উল্লাহ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, গত ২৬ আগস্ট তাদের ঘরে মিলিটারি ঢুকলে ভয়ে তিনি পালিয়ে যান। স্ত্রী ও ছয় ছেলেমেয়ে তখন ঘরেই ছিল। মিলিটারিরা ছেলেখেলার মতো রহমতকে গুলি করে চলে যায়। পরে ছেলেমেয়ে এবং বাবা মাসহ পালিয়ে নাইক্ষ্যাংছড়িতে চলে আসেন হাফিজ। আসার পথে সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যান মা। তাকে কোনো রকম মাটিচাপা দিয়ে ৩০ আগস্ট কুতুপালং ক্যাম্পে আসেন হাফিজ উল্লাহ।

গুলি নিয়ে ভর্তি হয়েছেন আরেক শিশু আজিফা (১১)। খেলার মাঠে খেলারত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয় সে। চট্টগ্রাম মেডিক্যালে অসুস্থতা নিয়ে ৮৫ জন ভর্তি হয়েছেন যাদের ৭০ জনই গুলিবিদ্ধ। আসার পথে রাস্তায়ই যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক মা। দুটিই মৃত। রাস্তার পাশেই কোনো রকমে দাফন করে আবার হাঁটা শুরু করেন বাংলাদেশের দিকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। এতে সার্বিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। পাখি শিকারের মতো নির্বিচারে মারা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। মায়ের চোখের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে মেয়েকে। শারীরিক-মানসিক নির্যাতন সয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা এসেছে বাংলাদেশে। যেন ঝড়ে পড়া একদল বিধ্বস্ত পাখি। মানসিকভাবে এরা সম্পূর্ণই ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু মানুষ হিসেবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন একজন মমতাময়ী মা, একজন একান্ত আপন বোন। মায়ের মমতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ষোলো কোটি মানুষ খেয়ে থাকলে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গারাও খাবে। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। আর বোনের আদরের হাত বাড়িয়েছেন সায়মা হোসেন পুতুল, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য তনয়া। প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যিনি তাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছেন। প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মানুষদের মানসিক কাউন্সেলিং দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছিলেন সায়মা হোসেন। তারই আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সিডিডি এবং সূচনা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২২ জন কর্মকর্তাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন তিনি। সে মোতাবেক প্রশিক্ষণ নেওয়া বিভিন্ন স্তরের ২২ জন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। তারা বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে এ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রোহিঙ্গাদের কাউন্সেলিং করছেন মানসিক বিপর্যস্ততা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য, ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য।

জীবনের শুরুতে যে শিশুটির স্বাভাবিক বেড়ে উঠার কথা ছিল আজ সে রোহিঙ্গা শিশুরা দেখছে চারপাশে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড আর দেশ ছাড়ার নির্মমতা। চোখের সামনে বাবাকে হত্যা করা হচ্ছে, মাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দিনের পর দিন না খেয়ে জীর্ণ-শীর্ণকায় এসব শিশুরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসছে। ক্ষুধায় চোখ কোটরাগত। চোখে বিভীষিকার ভয়। একদম চুপসে আছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১২ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত গণনায় ৩৬,২৭৩ জন এতিম শিশু পাওয়া গেছে। এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার। এদের অর্ধেক শিশুর বাবা-মা কেউ নেই। জীবন বাঁচাতে এরা পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে দলে ঢুকে দিনের পর দিন পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। আচ্ছা বয়সের তুলনায় এদের গড়পড়তা ওজন কত? অর্ধেকের বেশি হবে না। যেন নেতিয়ে পড়া লাউয়ের ডগা।

কক্সবাজারে আসা রোহিঙ্গা পরিবারের গড়পড়তা ৪-৬টি করে শিশু আছে যাদের বয়সের পার্থক্য এক থেকে দেড় বছর। এদের শতভাগই মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছেন। এত ঘন ঘন বাচ্চা নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। জানা যায়, লেখাপড়া করার তেমন কোনো স্কুল নেই রোহিঙ্গা অধিবাসীদের লোকালয়ে। বয়সি সন্তান বা সন্তানের

পিতা নগণ্য সংখ্যক। জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ মহিলাই বলে, হয় ধরে নিয়ে গেছে না হয় মেরে ফেলেছে। বিশ্বাসী এ ঘটনাকে এক ভিতিকর মানবিক বিপর্যয় বলে অভিহিত করছেন।

সম্ভবত নিকট অতীতে একসাথে এত শিশুর এমন অমানবিক বিপর্যয় বিশ্ব দেখেনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক পরিবার শিশুদের নিয়ে দেশ ছেড়েছে দু'দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা নিজেদের উন্নত ভবিষ্যতের আশায়। এখানে ব্যতিক্রম। রোহিঙ্গারা দেশ ছাড়ছে জাতিগত নিধনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। অথচ বংশপরম্পরায় এরা মিয়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানেই তাদের বাড়ি ঘর। কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব নেই। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, জাতিগত নিধনের কূটকৌশল হিসেবে রোহিঙ্গা এলাকায় খাদ্য ও পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। যাতে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।

বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গণতন্ত্র বিকাশের কারণে সভ্যতা এখন অনেক দূর এগিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। রয়েছে আধুনিক বিশ্বের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অধিকার। এমন আধুনিক যুগেও একটি জাতির নাগরিকত্ব থাকবে না, কোনো অধিকার পাবে না- এটা বিশ্ববাসী মেনে নিতে পারে না।

জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার দিয়ে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে বলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে রোহিঙ্গাদের নিয়ে ৫ দফা দাবি উপস্থাপন করেছেন। রোহিঙ্গা শিশুরা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠুক। শিশুদের উপর বিশ্বব্যাপী নির্যাতন, সহিংসতা আর হানাহানি বন্ধ হোক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মানবিকতা দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের বাঁচিয়েছেন, মিয়ানমার সরকারের সে মানবিকতার বোধ উদয় হোক, তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাক-এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ছবির মানুষ হীরালাল সেন

জীবন ও চলচ্চিত্র

বশিরুজ্জামান বশির

বাংলাদেশের বিখ্যাত ছবির মানুষ, উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেনের গ্রামের বাড়ি ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের

হীরালাল সেন

বগজুরিতে। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে তাঁর যে অবদান, তা অনেকে ভুলে গেলেও বাংলাদেশ এবং দেশের মানুষ তাঁকে মনে রেখেছেন। মনে রেখেছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষও।

হীরালাল সেন ছিলেন একজন বাঙালি চিত্রগ্রাহক। যাকে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া, তাকে ভারতের সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন বিষয়ক চলচ্চিত্রের নির্মাতা বলেও গণ্য করা হয়। ভারতের প্রথম রাজনৈতিক ছবিও তিনিই বানিয়েছিলেন। যা আমাদের গর্বের বিষয়। ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা মানে ১৯১৭ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁর তৈরি সকল চলচ্চিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর কর্ম আজ না থাকলেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখতে গেলে হীরালাল সেনকে উপেক্ষা করার শক্তি নেই কারো।

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, ভালো সিনেমা বানানোর সব রসদ আমাদের রয়েছে বা ছিল। তবে আমরা তা গ্রহণ করিনি। সিনেমার বিষয়বস্তু বা গল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সিনেমাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। শক্তিশালী ও সাহিত্যসমৃদ্ধ গল্পই ভালো সিনেমা হয়ে ওঠার অন্যতম সত্য। সিনেমা যে শুধু বিনোদন নয়, এই কথাটি তো নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তবু আমাদের দেশে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব পরিচালকেরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেননি। আমাদের আবহমান বাংলার মৌল জীবনধারা ও পরিবেশ, বৈচিত্র্যময় লোকজ ঐতিহ্য, লোক জীবনধারা ও সাহিত্য, ইতিহাস এবং আমাদের সার্বিক জীবনবোধ ও দর্শন আমাদের চলচ্চিত্রকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে পারত। সেই দিক দিয়ে আমাদের চলচ্চিত্রের মর্যাদাও বাড়ত, যা আমরা ভালোভাবে করতে পারিনি।

উপমহাদেশে সিনেমার বয়স একশ বছর বা এক শতাব্দী পার হলেও। ইউরোপ থেকে চলচ্চিত্র শুরু হলেও আমরা খুব পিছিয়ে ছিলাম না। বাংলাদেশে বায়োস্কোপ দেখা শুরু হয় ১৮৯৮ সালে ৪ এপ্রিল ভোলা জেলার এসডিও-র বাড়িতে। আর ওই সময়ে কলকাতায় দি বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করেন মানিকগঞ্জের ছেলে হীরালাল সেন। সেটাই বাঙালির প্রথম চলচ্চিত্র তৈরির প্রচেষ্টা। পরে উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র তৈরি হয় ১৯১৩ সালে। দাদাসাহেব ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে সেই ব্যক্তি, যিনি এই অসাধ্য সাধন করেন। 'রাজা হরিশচন্দ্র' নামে তার নির্বাক ছবি মুক্তি পায়। বাঙালিরা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯১৬ সালে কলকাতায় জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি করেন। এই ছবির প্রযোজক ছিলেন ঢাকার নওয়াব এস্টেটের ম্যানেজারের পুত্র প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমাদের আছে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি, যার অজস্র উপাদান ব্যবহার করে আমাদের চলচ্চিত্রকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির শুধু লোককাহিনি নিয়ে কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছে। অন্য উপাদান নিয়ে আরো নতুন ধারার চলচ্চিত্র তৈরি করা যায়। আমরা আমাদের গ্রামীণ পটভূমিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদিকে সহজেই সংযুক্ত করতে পারি। লোকসাহিত্য বা মৌলিক সাহিত্য (মৈমনসিংহ গীতিকা), লোকখেলা, লোকনাটক, গাজীর গান, যাত্রা, ব্রত, পুজো-পার্বণ, উৎসব, লোকগান–এসবের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এসব মৌলিক জীবনাচার থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নানা উপাদান গ্রহণ করা যায় আমাদের বর্তমান ডিজিটাল সিনেমার জন্য। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, আমাদের অজস্র কবিয়াল রয়েছেন, যারা তাদের জীবনযাত্রা ও গানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। পালা বা গাজীর গান নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সিনেমা বানানো উচিত ছিল বলে আমার ধারণা।

লোককাহিনি নিয়ে যে সব সিনেমা নির্মিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। শুরু করেছিলেন সালাহ্উদ্দিন। ১৯৬৫ সালের ৫ নভেম্বর তার লোককাহিনিভিত্তিক ছবি 'রূপবান' মুক্তি পায়। কয়েক বছর পর ১৯৬৯ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'আলোমতি' নামক ছবি। পরের ব্যক্তি হলেন সফদার আলী ভুঁইয়া। তিনি 'রূপবান'-কে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। তার ছবির নাম ছিল 'রহিম বাদশাহ' ও 'রূপবান'। পরবর্তীকালে এধারার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো–খান আতাউরের

রূপবান ছায়াছবির একটি দৃশ্য

'রাজা সন্ন্যাসী', ইবনে মিজানের 'আবার বনবাসে রূপবান', সৈয়দ আউয়ালের 'গুনাই বিবি', আলী মনসুরের 'মহুয়া', জহির রায়হানের 'বেহুলা' ও ইবনে মিজানের 'জরিনা সুন্দরী'। এই ধারায় আরো পাওয়া যায় সফদার আলী ভুঁইয়ার 'কাঞ্চনমালা', ইবনে মিজানের 'জংলী মেয়ে', নজরুল ইসলামের 'আলীবাবা'। পরবর্তীকালে আজিজুর রহমানের 'মধুমালা', খান আতাউর রহমানের 'সাত ভাই চম্পা', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', মহিউদ্দিনের 'গাজী কালু চম্পাবতী'।

বাংলাদেশের মানুষ শহরবাসী হলেও ফোকের বৈশিষ্ট্য লালন করে এখনো। তার রক্তে ফোকের গন্ধ। সেই কারণে ফোক জনগোষ্ঠী নিয়ে বা তাদের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছবি হলেই তারা সিনেমা হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এর মধ্যে গ্রামীণ জনগণ ছিল, তবে গ্রামে সিনেমা হল না থাকায় তারা কষ্ট করে শহরে এসে সিনেমা দেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এই লোকজন সিনেমা বলতে আগের যাত্রাকে বুঝত। যাত্রায় যা যেমনভাবে তারা দেখত তাই যখন সিনেমা হলে দেখতে পেয়েছে, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়েছে, তারা চূড়ান্ত আনন্দ পেয়েছে। 'রূপবান' যাত্রা একসময় বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গ্রামে গ্রামে মহল্লায় 'রূপবান' দেখার হিড়িক পড়ে যেত। সেই রূপবানের পালা যখন সিনেমায় এলো তখন ব্যাপক সাড়া দিলো সাধারণ মানুষ। রাত জেগে জেগে হাজার হাজার মানুষ 'রূপবান' দেখেছে। বারো বছরের রূপবানের সাথে রহিমের বিয়ে। এরপর রূপবানের কষ্টের জীবন দর্শককে নাড়া দেয় ভীষণভাবে। এই নাড়া দেওয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ১৯৮৯ সালে তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত 'বেদের মেয়ে জোছনা' মুক্তি পায়, যা বাংলাদেশে সবচেয়ে ব্যবসা সফল ছবি। ছবির ব্যবসার সব হিসাব পালটে দেয় এই ছবি। তথ্য অনুযায়ী ১ কোটি টাকার বাজার থেকে এই ছবি প্রায় ১৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এর কাহিনিও যাত্রার সূত্র থেকে আমদানি।

হীরালাল সেনের জন্ম ২ আগস্ট ১৮৬৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে হলেও তিনি একসময় ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রমোহন সেন, মাতা বিধুমুখী। পিতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুনশি ছিলেন ঢাকার জজ আদালতের নামকরা আইনজীবী। পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। পিতামাতার আট সন্তানের মধ্যে হীরালাল সেন ছিলেন দ্বিতীয়। মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। একই সাথে মৌলভী সাহেবের কাছে ফারসি ভাষাও শিখতেন। ১৯৭৯ সালে মাইনর পরীক্ষা পাস করে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। পরে পিতার সাথে হীরালাল সেন কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হন। আইএসসি অধ্যয়নকালে চলচ্চিত্রের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় যবনিকাপাত ঘটে।

১৮৯৮ সালে, প্যারিসের 'পাথে ফ্রেরেস স্টুডিও'র সদস্য অধ্যাপক স্টিভেনসনের একটি নাতিদীর্ঘ ছবি কলকাতার স্টার থিয়েটারে দেখানো হয়, The Flower of Persia (পারস্যের ফুল) নামে একটি অপেরার সঙ্গে। স্টিভেনসনের ক্যামেরা ধার করে নিয়ে হীরালাল বানান তাঁর প্রথম ছবি- A Dancing Scene From the Opera, The Flower of Persia, ওই অপেরার একটি নাচের দৃশ্য নিয়েই। ভাই মতিলাল সেনের সাহায্যে লন্ডনের ওয়ারউইক ট্রেডিং কোম্পানির চার্লস আরবান থেকে তিনি একটি 'Urban Bioscope' কিনে নেন। পরের বছর তিনি ভাইয়ের সাথে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির গোড়াপত্তন করেন।

হীরালাল সেনের বিয়ে হয় হেমাঙ্গিনী দেবীর সাথে। তাঁদের তিন সন্তানের কথা জানা যায়। প্রথম পুত্র বৈদ্যনাথ সেন ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় সন্তান মেয়ে প্রতিভা সেন তিথির বিয়ে হয় নরনাথ সেনের সাথে। নরনাথ সেনের ভাইপো দিবানাথ সেনের স্ত্রী ছিলেন কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেন।

হীরালাল সেনের সৃষ্টিশীল কর্মজীবন ব্যাপ্ত ছিল ১৯১৩ অবধি, যার মধ্যে তিনি চল্লিশটিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। বেশিরভাগ ছবিতেই তিনি ক্যামেরাবদ্ধ করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ বিভিন্ন থিয়েটারের দৃশ্য। সেই যুগে ব্যবহারযোগ্য ফিল্ম আনা হতো বিদেশ থেকে। ১৯০১ আর ১৯০৪-এর মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের পক্ষে তিনি অনেকগুলো ছবি নির্মাণ করেন। যথা– ভ্রমর, হরিরাজ, বুদ্ধদেব ইত্যাদি। তাঁর তৈরি ছবির মধ্যে একটি ছিল পূর্ণদৈর্ঘ্যের ১৯০৩-এ তৈরি আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, যেটি বানানো হয়েছিল ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত ওই নামের থিয়েটারের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এ ছবির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ সম্ভবত কোনোদিনই এ ছবির প্রদর্শন হয়নি। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনি কতগুলো বিজ্ঞাপন বিষয়ক আর কিছু সংবাদমূলক চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেন। তিনি 'জবাকুসুম হেয়ার অয়েল' আর 'এডওয়ার্ডস টনিক'-এর ওপর বিজ্ঞাপনী ছবি বানিয়েছিলেন। সম্ভবত, ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞাপনে ফিল্ম ব্যবহার করায় তিনিই প্রথম ছিলেন। হীরালাল সেনের তৈরি তথ্যছবি

বেহুলা ছায়াছবির একটি দৃশ্য

ভারতের প্রথম রাজনীতিক চলচ্চিত্র বলে গণ্য করা হয়।

রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রথম ছবি বানায় ১৯১৩ সালে। এরপর হীরালাল সেন অনেক দুর্গতি আর অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানির জামশেদজি ফ্রেমজি ম্যাডান তাঁর থেকে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেন। ছবির মানুষ হীরালাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ১৯১৭ সালের ২৯ অক্টোবর চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ হীরালাল সেন চিরনিদ্রায় শায়িত হন। বাংলাদেশে এবং উপমহাদেশেও তিনি চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে আজও বিরাজমান।

বাংলা চলচ্চিত্র তথা এশিয়ান চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেনের জন্মদিন এবং মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা একান্ত জরুরি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দীর্ঘদিনের অবহেলায় হীরালাল সেনের স্মৃতি যেখানে বিস্মৃত প্রায়, সেখানে মানুষটির জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের খোঁজ কে রাখে! ঢাকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার বাইরে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রথম স্বদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা বাংলাদেশের কৃতী সন্তান হীরালাল সেন। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের এই মহীরুহ মানুষটি আমাদের জাতির গর্ব। আগামী প্রজন্মের জন্য ছবির মানুষ হীরালাল সেন একটি ইতিহাস।

লেখক : কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

হাবিবুর রহমান স্বপন

প্রীতি-ভালোবাসা কোনোদিন বিফলে যায় না। শতধারায় তা ফিরে আসে নিজের কাছেই। বৃষ্টির ধারা, ঝরনার স্রোত বয়ে যায়, আবার তা ফিরে আসে আপনার উৎসমুখে। ইংরেজ কবি কিটস লিখেছেন, 'ভালোবাসা যে পেল না আর ভালোবাসা যে কাউকে দিতে পারল না, সংসারে তার মতো দুর্ভাগা যেন আর নেই।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'শেষের কবিতা'য় লিখেছেন, 'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ।' ভালোবাসা নিয়ে কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের করা এমন হাজারো উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত লেখক-উপন্যাসিক টলস্টয় লিখেছেন, 'ভালোবাসার অর্থ হলো, যাকে তুমি ভালোবাসো তার মতো জীবন যাপন করো।' আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'যাকে সত্যিকার ভালোবাসা যায়, সে অতি অপমান আঘাত করলে, হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যাহাকে ভালোবাসো তাহাকে চোখের অন্তরাল করিও না।' মহাকবি কালিদাস লিখেছেন, 'ভালোবাসা জিনিসটা ভোগ করিতে না পেলে তার প্রতি স্নেহটা দিন দিন প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হয়।' রুশ সাহিত্যিক আলেকজান্ডার পুশকিন লিখেছেন, 'ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, এক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না।'

মানুষ প্রিয়জনের কাছে তার মনের গভীরে জমে থাকা ভালোবাসা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নানা কায়দায় প্রকাশ করে থাকে। প্রতি বছর বিশ্বের দেশে দেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক হয় কীভাবে উৎপত্তি বা শুরু হলো এই ভালোবাসা দিবস বা 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। এমন একটি বিষয়ের প্রতি মানুষের কৌতূহলটা অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

খ্রিষ্টীয় ইতিহাসে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নিয়ে বহু কাহিনি রয়েছে। ২৬৯ সালের কথা। সাম্রাজ্যবাদী, রক্তপিপাসু রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের দরকার এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর। একসময় তার সেনাবাহিনীতে সৈন্য সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদানে যুবকদের আগ্রহ একেবারেই ছিল না। কিন্তু সম্রাটের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত যুবকরাই যুদ্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ। তারা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে অত্যধিক ধৈর্যশীল হয়। ফলে তিনি যুবকদের বিবাহ কিংবা যুগলবন্দি হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। যাতে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ না করে। তার এই আদেশে যুবক-যুবতীরা ক্ষেপে যায়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামের এক যুবক ধর্মযাজকও সম্রাটের এই নিষেধাজ্ঞা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি।

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন রাজার আদেশ অবজ্ঞা করে ভালোবেসে সেন্ট মারিয়াসকে বিয়ে করেন। শুধু তাই নয়, তিনি রাজার আদেশ অমান্য করে তার গির্জায় গোপনে বিয়ে পড়ানোর কাজও করতে থাকেন। একটি কক্ষে মোমবাতির স্বল্প আলোতে ফিসফিস করে বিয়ের মন্ত্র পড়াতেন ভ্যালেন্টাইন। কিন্তু বিষয়টি সম্রাট ক্লডিয়াসের কর্ণগোচর হলে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। কারারুদ্ধ সেন্ট ভ্যলেন্টাইনকে এক নজর দেখার জন্য কারাগারে প্রেমাসক্ত যুবক-যুবতীরা প্রতিদিন কারাগারে আসত ফুল ও উপহারসামগ্রী নিয়ে। তারা সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে উদ্দীপনামূলক কথাবার্তায় উদ্দীপ্ত রাখত। এক কারারক্ষীর অন্ধ মেয়েও আসত ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে। তারা অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে কথা বলত। এভাবে তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় মেয়েটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। রাজা তার এই আধ্যাত্মিকতার খবর পায় এবং ভ্যালেন্টাইনকে রাজ দরবারে হাজির করার নির্দেশ দেন। রাজা

তাকে রাজকর্মে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেন। বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা হলে রাজার দেওয়া এই প্রস্তাব পালনে ভ্যালেন্টাইন অস্বীকৃতি জানান। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নের ঠিক আগ মুহূর্তে ভ্যালেন্টাইন কারারক্ষীদের কাছে কাগজ ও কলম চেয়ে নেন। তিনি মেয়েটির কাছে একটি গোপন চিঠি লেখেন এবং শেষাংশে বিদায় সম্ভাষণে লেখেন 'ফ্রম ইউর ভ্যালেন্টাইন'। এটা ছিল এমন একটি শব্দ, যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। অতঃপর ১৪ ফেব্রুয়ারি মহান প্রেমিক ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এ ঘটনা আবার অন্যভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রিসের রাজা দ্বিতীয় ক্লডিয়াস ছিলেন, 'প্যাগান' ধর্মাবলম্বী। প্যাগানরা ছিল মূর্তিপূজারি। তার সময় খ্রিষ্টধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে। তখন একজন যুবক পাদ্রি ছিলেন। তার নাম ছিল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। রাজা ক্লডিয়াস তার রোমান রাজ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেন। আদেশ জারি করেন যে বা যারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার। রাজার আদেশ উপেক্ষা করে ভ্যালেন্টাইন খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং ভ্যালেন্টাইনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন এবং বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। রাজা ভ্যালেন্টাইনকে 'প্যাগান' মতবাদ মেনে নেওয়ার শর্তে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিলে ভ্যালেন্টাইন তা প্রত্যাখ্যান করেন। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় জেলার অ্যাসটেরিয়াসের যুবতী সুন্দরী অন্ধ কন্যা ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে আসে। যদিও সে চোখে দেখে না তবুও তাদের প্রায় প্রতিদিনই কথা হয়। তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে। ভ্যালেন্টাইনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় সুন্দরী জুলিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। এতে রাজা ক্লডিয়াস আরও ক্ষুব্ধ হন। এছাড়া ভ্যালেন্টাইনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। রাজা ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরের আদেশ দেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে ভ্যালেন্টাইন একটি চিরকুটে প্রেমিকা জুলিয়াকে চিঠি লেখেন। চিঠিটি শেষ করেন, 'Yours Valentine' লিখে।

ভালোবাসার রকমফের আছে। পিতা-পুত্র বা সন্তান ও পিতা-মাতার ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা, ভাই-বোনের ভালোবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা, দেশ বা জাতির প্রতি ভালোবাসা, জীবের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি। যার ভালোবাসা যত প্রবল তার যশ সুনাম তত বেশি। হাদিসে বলা হয়েছে, 'আল্লাহকে ভালোবাসার ইচ্ছা থাকলে মানুষকে ভালোবাসতে শেখ'। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, 'জীবে দয়া কর'। তিনি বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মানবপ্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম'। তিনি সকলের প্রতি সদয় হতে বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী ভালোবাসা থেকেই অহিংসার মহান বাণী প্রচার করে গেছেন। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'আমি এথেন্সবাসী নই, আমি গ্রিকও নই, আমি বিশ্বের নাগরিক।' যারা ভালোবাসার কথা বলেছেন এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন তারা তত মহান এবং স্থায়ী বা স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন।

ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার গোলাপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো এদেশেও ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' উদ্‌যাপন হচ্ছে। জাতীয়ভাবে নয়। এই দিবসটি পালনে সক্রিয় যুবক-যুবতীরা বা প্রেমিক-প্রেমিকারা। মাত্র ক'বছর আগে এই দিবস সম্পর্কে এদেশের মানুষ জানতে পেরেছে, যা ক্রমশ প্রসার লাভ করছে।

'ভালোবাসা' সাহিত্যের অন্যতম বিষয়। সকল ভাষায় যত গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক রচিত হয়েছে এর সিংহভাগের বিষয়ই হচ্ছে ভালোবাসা। ইংরেজ কবি শেলি লিখেছেন, 'মানুষ সর্বদাই কিছু না কিছু ভালোবাসিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু যাহা অনন্ত, যাহা অবিনশ্বর তাহাকে এই মর্তের দুয়ারের মধ্যে খোঁজা ভ্রান্তি ব্যতীত কিছু নয়।' বিশ্বখ্যাত লেখক দস্তয়েভস্কি লিখেছেন, 'প্রথমে যদি কাউকে খারাপ লাগে তবে নির্ঘাত তাকে ভালো লাগবে পরে।'

এখন কথা হচ্ছে আমি বা আপনি যাকে ভালোবাসব বা বাসি তিনি তো দেবতা নন। তিনি আপনজন বা প্রেমিকজন। তাই তাকেই দিতে হবে সুগন্ধিযুক্ত ফুল। দিতে পারেন একটি গোলাপ কিংবা হাসনাহেনা অথবা রজনীগন্ধা। আতর কিংবা সেন্টও (পারফিউম) দেওয়া যেতে পারে। মোট কথা, ভালোবাসার বহির্প্রকাশ হতে হবে মনে-অন্তরে এবং কর্মে।

আজকের এই দিনে প্রেমিক তার প্রেমিকার উদ্দেশে গাইতে পারেন, 'ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো-তোমার মনের মন্দিরে।' বাংলা ভাষায় এটিই এ যাবৎকালের সেরা প্রেমের গান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বিবিসি বাংলা বিভাগের জরিপে। আর যদি প্রেমাসক্তরা মনের মতো ভালোবাসার সহযোগী খুঁজে না পান তাহলে মনের আনন্দে দেশকে ভালোবেসে গাইতে পারেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

ভালোবাসতে হবে নিজের প্রয়োজনেই, প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় নয়। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে ভালোবাসার একটিমাত্র উপায় আছে, তা হলো প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া। হ্যাঁ, গভীর ভালোবাসার কোনো ছিদ্রপথ নেই।

লেখক : সাংবাদিক

উচ্চারণ বিভ্রাট

এম কিউ জামান

আমরা লেখার ক্ষেত্রে সাধু অথবা চলিত ভাষা এবং বলার ক্ষেত্রে প্রমিত চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু শব্দগত আর বাকিটা উচ্চারণগত। আঞ্চলিক ভাষা যাই হোক না কেন, তাতে সমস্যা নেই। কারণ প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার একটা নিজস্ব রীতি আছে

এবং সেটাও একটা স্ট্যান্ডার্ড ও শুদ্ধ। কিন্তু সমস্যা হলো বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে। কেউ কেউ অল্পপ্রাণ (ক, গ, চ, জ, ট, ত, দ, ড, প, ব ইত্যাদি) আর মহাপ্রাণ (খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ধ, থ, ঢ, ফ, ভ ইত্যাদি) বর্ণের উচ্চারণ গুলিয়ে ফেলে। আবার কারো ও-কার, উ-কার নিয়েও সমস্যা আছে। এগুলো নিয়েই ঘটে নানান বিভ্রাট।

একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি। অনেকদিন আগের কথা। তখন বাজারে রট (Wrought) আয়রনের মিটসেফ বের হয়েছে। এক ভদ্রলোক নিউমার্কেটের পেছনের দোকানগুলোতে গেলেন একটা ছোটো মিটসেফ কিনবেন বলে। এক দোকানে ঢুকে দরদাম করলেন। দোকানি একদাম জানিয়ে দিলেন, চারশ টাকা। দাম কমাবে না জেনে ভদ্রলোক পাশের দোকানে ঢুকলেন। এই দোকানদার চেয়ে বসল ৬০০ টাকা। ভদ্রলোক কিছুটা বিরক্তিমাখা কণ্ঠে তাকে বললেন, তুমি দাম বেশি চাচ্ছ কেন? পাশের দোকানে এই একই সাইজের একটা দেখলাম, দাম বলল, ৪০০ টাকা আর তুমি চাচ্ছ ৬০০ টাকা, কেন? এবার দোকানি বলল, ঐটা হইলো চিকন প্রেম আর আমারটা মোটা প্রেম। এবার ভদ্রলোক ভিমরি খেলেন। বুঝতে পারছিলেন না, মিটসেফের সাথে প্রেমের কী সম্পর্ক? একটু চিন্তা করতেই তিনি বুঝে গেলেন, আসলে দোকানি প্রেম দিয়ে ফ্রেম বুঝাতে চাইছে। মহাপ্রাণ 'ফ' ধ্বনি অল্পপ্রাণ 'প' ধ্বনিতে রূপান্তর হওয়ার কারণে ফ্রেম হয়ে গেছে প্রেম। আসল কথা হলো, ওই দোকানের মিটসেফ চিকন রট আয়রন দিয়ে বানানো বলে ওটার দাম কম আর এই দোকানের মিটসেফ মোটা ফ্রেমের তৈরি, তাই দাম বেশি। এবার বুঝুন! আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

প আর ফ-এর বিভ্রাট হলে ফালতুকে বলবে পালতু, ফাউল হবে পাউল, ফাইনাল হবে পাইনাল, ফ্রিজ হয়ে যাবে প্রিজ। সেটা না হয় বুঝে নিলেন। কিন্তু কেউ যদি পান খেয়ে কারো মজার গল্প শুনে হেসে উঠে বলে, তোমার পানটা খুব মজার! তাহলে কী বুঝবেন? সেটা খিলি পান নাকি কৌতুক ফান বুঝে নিতে সময় লাগবে। আবার কোনো ব্রিজের পাশে ফুল দেখে কেউ যদি বলে উঠে পুলটা সুন্দর! তখনও আপনি দ্বিধায় পড়ে যাবেন সে কী সেতুটির নির্মাণশৈলীকে সুন্দর বলেছে নাকি পুষ্পের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ফুলের কথা বলেছে? এভাবে কেউ যখন ফ্যাশনকে বলবে প্যাশন তখন আপনি কোনটা বুঝবেন? কারণ দুদিকের শব্দই অর্থবোধক। এ ধরনের উচ্চারণদুষ্ট লোকেরা আবার উলটোদিকে পাইপকে বলবে ফাইপ; তাদের কাছে পাঁচ হবে ফাঁচ, পাখি হবে ফাকি, পাকা হবে ফাকা আর প্রেস পরিণত হবে ফ্রেশ-এ।

তেমনি আবার ব আর ভ এর বিভ্রাট হলে বোন-কে বলবে ভোন, ভাই-কে বলবে বাই। তেমনি ভাত-কে বলবে বাত, গর্ব হয়ে যেতে পারে গর্ভ। এখন বক্তা কোনটা বুঝিয়েছে, আপনি কীভাবে ধরবেন? আবার যদি ত, থ, ব আর ভ-এর গণ্ডগোল বাধে, তাহলে বাথরুম হবে ভাতরুম। ক আর খ-এর বিভ্রাট হলে খবর-কে বলবে কবর, কাজ হবে খাজ, খাসি-কে বলবে কাশি। এই কাশি আর খাসি নিয়ে একটা ঘটনা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের এক দূতাবাসে এক কর্মকর্তার কাছে বাংলাদেশি এক শ্রমিক এসে বলল, স্যার,

আমি কিন্তু খাসির কামও পারি। অফিসার অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি, লেবারের কাজ ছাড়া তুমি খাসির কাজও করতে পার (অফিসার ভাবলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ছাগল খাসি করার প্রচলন নেই, সেই কাজটাই মনে হয় এ বেচারা অবসর সময়ে করে একটু বাড়তি আয় করে)? শ্রমিকের জবাব, জি স্যার, যে-কোনো বিল্ডিংয়ের যেমন খাসির কাজই হোক, আমি পারি। এবার অফিসার বুঝতে পারলেন, আসলে শ্রমিকটি খাসি দ্বারা কাশি বুঝাতে চেয়েছে। আরব দেশে টাইলস-কে কাশি বলে। মানে ওই শ্রমিকটি বুঝাতে চাইছে, সে টাইলস-এর কাজও জানে।

প, ফ আর ব, ভ- এই ৪টা অক্ষরের যৌথ বিভ্রাট নিয়ে আরেকটা সত্যি ঘটনা বলি। হোটেল থেকে কয়েকজনের জন্য সকালের নাস্তা আনতে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পিওনকে বলা হলো, পরাটা আর তন্দুরের সাথে সবজি, বুটের ডাল, খাশির পায়া আর বিফ নিয়ে আসতে। যার যেটা ইচ্ছা খাবে। পিওন ডিসপোজেবল প্লাস্টিক বাটিতে করে তরকারি নিয়ে এসেছে। বাটিগুলোর ওপর লিখা আছে কোনটা কী? বিফ কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বিফ আনোনি? পিওনের তৎক্ষণাৎ জবাব, স্যার, আনছি তো! তিনি বললেন-কই, আমিতো দেখি না? কেন, স্যার, এই যে? বলে পিওন একটা বাটি এগিয়ে দিল। তিনি দেখলেন, ওটার ঢাকনাতে সুন্দর করে লেখা 'ভিপ'।

ওদিকে আবার উ-কার আর ও-কার-এর বিভ্রাট হলে চোরকে বলবে চুর। এমনিভাবে গোল হয়ে যাবে গুল এবং ভোরবেলা হয়ে যাবে ভুরবেলা।

তাছাড়া, অ-কার আর ও-কার গোলমেলে হয়ে গেলে পঞ্চাশ হয়ে যাবে পোঞ্চাশ আর দমকল হয় দোমকল। কম হয়ে যাবে কোম।

দ আর ধ-এর বিভ্রাট হলে ধান-কে বলবে দান।

ড আর ঢ-এর বিভ্রাট হলে ঢাকা-কে বলবে ডাকা।

জ আর ঝ- এর বিভ্রাট হলে ঝাড়ু-কে বলবে জাড়ু, ঝামেলা হয়ে যাবে জামেলা।

চ আর ছ- এর বিভ্রাট হলে ছাতা হয়ে যাবে চাতা, উলটোদিকে চাই হয়ে যেতে পারে ছাই।

আবার ত আর থ-এর বিভ্রাট হলে থাকি হয়ে যাবে তাকি। থানা হবে তানা।

গ আর ঘ-এর বিভ্রাট হলে ঘোড়া হবে গোড়া। গায়ের ঘাম হবে আঠালো গাম আর ঘুম হয়ে যাবে গুম।

ট আর ঠ- এর বিভ্রাট হলে ঠিকানা পালটে টিকানা হবে এবং ঠাণ্ডা হয়ে যাবে টাণ্ডা। আবার উলটোদিকে টাউট হয়ে যেতে পারে ঠাউঠ।

এই ঝামেলা ও জামেলা নিয়ে একটা গল্প বলি। এক অফিসে জরুরি কাজ চলছে। তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। খসড়া টাইপ করতে হবে। অফিসার বললেন, জামিলা আছে? তখন পাশের একজন স্টাফ, যার জ ও ঝ এবং এ-কার ও ই-কার এর মধ্যে সমস্যা আছে, তিনি জবাব দিলেন, স্যার এর মধ্যে জামিলা থাকবে কেন-কাজটাতো সোজা। অফিসার বললেন, কেন, সে চলে গেছে নাকি? স্টাফ বললেন, স্যার আপনে কোন জামিলার কথা বলছেন? অফিসারের উত্তর- আরে আমি ঝামেলার কথা বলিনি। আমি টাইপিস্ট জামিলার কথা বলেছি।

র আর ড়-এর মধ্যেও ভেজাল আছে। প্রায় সব এলাকার অনেক মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বিদ্যমান। তারা বাড়ি-কে বলে বারি, গাড়ি হয় গারি, কাড়াকাড়ি হয় কারাকারি, পড়া হয় পরা। উলটোদিকে মারামারি হয়ে যেতে পারে মাড়ামাড়ি, ঘর হবে ঘড়।

এবার ছাত্র-শিক্ষকের উচ্চারণ সংকট নিয়ে একটা গল্প বলে শেষ করছি।

শিক্ষক: বলতো, গুরা ইংরেজি কী?
ছাত্র: পাউডার।
শিক্ষক: গুরা না, গুরা।
ছাত্র: নট পাউডার, পাউডার।
শিক্ষক: ধুত্তরি, এইটার ইংরেজি কইতে কই নাই। এই গুরা না।
ছাত্র: তাহলে কোন গুরা?

শিক্ষক: আরে বোকা, গুরা ৪ প্রকার। একটা গুরার চার পা আছে, লাফায়। ওইটার ইংরেজি Horse। আরেকটা গুরা ক্রিয়াপদ, চক্কর মারে, মানে Turn Round। আরেকটা গুরা হইলো কোনো জিনিসের নিচের দিক, মানে Bottom। তুই যেইটা কইলি, সেই গুরা হইলো- মিহি দানা, চড়ফিবৎ। আমি তোরে গুরার ইংরেজি কইতে কইছিলাম।

ছাত্র: স্যার, আমিতো গুরার ইংরেজিই বলেছি।

শিক্ষক: আরে না, তুই গুরার ইংরেজি কইছস, গুরার কস নাই।

উচ্চারণ দোষে দুষ্ট ছাত্র-শিক্ষকের এই জট ছাড়ানো খুব কঠিন। আসলে শব্দ ৪টি- ঘোড়া, ঘুরা বা ঘোরা, গোড়া আর গুঁড়া। কিন্তু গ, ঘ, র, ড় এবং ও-কার ও উ-কার সব এক হয়ে যাওয়াতে এখানে শিক্ষক কী বুঝাতে চেয়েছেন আর ছাত্রই বা কী বুঝেছে সেটা আমাদের জানা নেই। তবে এ ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য আমাদের মাতৃভাষায় শুধু লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করলেই চলবে না উচ্চারণও ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে।

লেখক: সিনিয়র সম্পাদক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

কী নামে কার খ্যাতি

শামসুল করীম খোকন

'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলাম
'আংকেল হো' উপাধি যাঁর হো চি মিন তাঁর নাম
'বঙ্গবন্ধু' উপাধি শেখ মুজিবুর রহমান
'সীমান্ত গান্ধী' খ্যাত আব্দুল গফফার খান।
'পল্লী কবি' উপাধি যার নাম জসীম উদ্‌দীন
'উন্মাদ সন্ন্যাসী' রাশিয়ার রাসপুটিন।
'ব্লাইন্ড বার্ড' গ্রীসের কবি নাম তার হোমার
'লৌহমানবী' খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার।
'বার্ড অব হেভেন কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার
জর্জ ক্লেমেড ফ্রান্সবাসী উপাধি 'টাইগার'।
প্রিন্স বিসমার্ক 'আধুনিক-জার্মানির জনক'
আলফ্রেড দ্য গ্রেটের খ্যাতি 'আইনের শাসক'।
'নেতাজী' উপাধি যাঁর সুভাষ চন্দ্র বোস।
'বাংলার বাঘ' শেরে বাংলা কর্মে ছিল যোশ।
'শান্তির মানুষ' লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সবে জানো
'ডটার অব দ্য ইস্ট' বেনজীর ভুট্টোকেই মানো।
'ভারতের নাইটিঙ্গেল' সরোজিনী নাইডু যিনি
'ফুয়েরার' উপাধি যাঁর এডলফ হিটলার তিনি
উম্মে কুলসুম হলো 'আরবের নাইটিঙ্গেল'
'ডেজার্ট ফক্স' উপাধি ফিল্ড মার্শাল রোমেল
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'কায়েদে আযম'
'কুমারী রানী' রানী এলিজাবেথ প্রথম।
'জিবিএস' জর্জ বানার্ডশ মনে রাখা চাই
জওহরলাল নেহেরু 'চাচা' জানো সর্বদাই।
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 'ম্যান অব ডেসটিনি'
আইজেন হওয়ার 'আইক' নিন সকলে চিনি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি 'বিশ্বকবি'
'আতাতুর্ক' নামে ভাসে কামাল পাশার ছবি।
সূর্যসেনের 'মাস্টার দা' উপাধি নিশ্চয়
জয়নল আবেদীন 'শিল্পাচার্য' খ্যাতি তাঁর অক্ষয়।

মানুষ সুন্দর

রুস্তম আলী

সুন্দর সুন্দর যত দেখি সুন্দর দু'নয়নে-
মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নাহি এ ভুবনে।
পাখি সুন্দর পালকের পাখায়।
আকাশ সুন্দর উদারতায়।
পাহাড় সুন্দর ঝর্না ধারায়।
চাঁদ সুন্দর আলো-আঁধারে।
সাগর সুন্দর গভীরতায়।
পৃথিবী সুন্দর মায়ার বাঁধনে।
সৌন্দর্য বুদ্ধিমত্তা সাহসিকতা
ও সুন্দর একটা মনের
দুরন্ত মিশেল মানুষ।
মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নাহি এ ভুবনে।
গোলাপ ও সুন্দর মানুষের জন্যে।
মানুষ সুন্দর তাঁর নিজ গুণে।

ছুটির নিমন্ত্রণে

সঞ্চারী হক

এইতো সেদিন/ ছুটির নিমন্ত্রণে
কিছুটা সময় কাটিয়ে এলাম/ আকাশ-পাহাড় আর
সমুদ্রের সাথে।
যেখানে আকাশ ছুঁয়ে যায় সমুদ্রকে/ মেঘ চুপিসারে কথা কয়
সবুজে ঘেরা পাহাড়ের সাথে।
সুন্দর প্রকৃতির এই লীলাভূমির/ বৈচিত্র্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার
আনন্দের কাছে হার মানে বিষণ্নতা, ক্লান্তি-অবসাদ।
বাতাসের আদুরে স্পর্শে/ খানিকটা ডুবে যায় মনপ্রাণ।
কি দারুণ অনুভূতি-/ যার কোনো তুলনা হয় না কখনো।
এক বুক নিশ্বাসে শান্তির প্রলেপ/ ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ের সমস্ত আঙিনায়
যেটুকু সময় ছিলাম/ তার চেয়ে বেশি পেয়ে ভালোই ছিলাম।
হৃদয় মাঝে একরাশ ভালোলাগার আলপনা এঁকে
আবার ফিরে এলাম প্রিয় আপনালয়ে।

স্বাধীনতার কবিতা

রফিকুল হক

টুঙ্গীপাড়ায় ঘুমিয়ে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব,
১৬ কোটি মুজিব বাংলায় এখনো সজীব।
BANGABANDHU ALWAYS IDEOLIZED BY MILLIONS,
BANGABANDHU IS ALSO 16-CORE PEOPLE'S SONG.
৭ই মার্চ হ্যামিলনের বাঁশীতে বাজিয়ে ছিলে মুক্তির যে গান,
অগ্নিঝরা সেই দিনগুলিতে রাজপথ ছাড়েনি তোমার সাড়ে সাত কোটি সন্তান।
বজকণ্ঠে বলেছিলে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'
তোমার আদেশ পালন করেছে জাতি হয়েছে সফলকাম।
নয় মাস যুদ্ধে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় লক্ষাধিক পাকসেনা,
তা নাহলে জাতির বীরযোদ্ধাদের যে মোটেই মানায় না।
'নন মার্শাল রেসের' মোহর এঁকে দিয়েছিল জাতির পিঠে,
তোমার ৬দফা আন্দোলনে যালিমদের সব চক্রান্ত হয়েছিল ফিকে।
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীর সর্ববৃহৎ দল, বাংলা মায়ের সেনা,
ব্যর্থ-গরিব-বর্বর জাতির কথায় মোদের কিছুই যায় আসে না।
বঙ্গ ইতিহাসের শিরোমনি, তুমি যে বিস্ময়,
জাতিকে 'ম্যাগনা-কার্টার' যে সুধা পান করিয়েছ, তোমার নাইকো লয়।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
বাংলার মানুষ কভু ভুলতে পারেনা তোমার কালজয়ী জয়গান।
টুঙ্গিপাড়া হতে দেখতে পাও তোমার হাসিনা আজ বিশ্বনেতা,
কেন হবে না বাঙালির নয়নমণি, তুমি যে তাঁর পিতা।
বহির্বিশ্বের সাথে হচ্ছে প্রতিনিয়ত উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক চুক্তি,
দেশবাসী নিশ্চিত যে, এবার হবে জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি।
উপরোক্ত চুক্তি আর বিশ্বনেতার ঘোষিত শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল,
বাস্তবায়িত হলে পরে, দরিদ্রতা দূর হয়ে দেশ হবে অধিক উন্নত সফল।
তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে উল্কার মতো,
ছুটে যান দেশ দেশান্তরে বিরতিহীন, প্রতিনিয়ত।
দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক কিংবা হোক আন্তর্জাতিক,
উন্নয়ন-মূল্যায়নের বহিঃজরিপেও সরকারের সাফল্য সর্বাধিক।
১৯ সালের নির্বাচনে হবে জাতির ভাগ্য পুনঃনির্ধারণ।
সত্তর, একাত্তরে ভুল করেনি জাতি, ১৯-এ ও তেমন।
Mirror Mirror On The Wall,
Sheikh Hasina Looks Like Mahathir Of Bengal
(একাত্তরে, দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, বিত্ত-বৈভব-আবাস সবকিছু ছেড়ে,
লক্ষ লক্ষ দেশবাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কোথায় আশ্রয় পেলে !
ট্রেনিং-অস্ত্র, খাদ্য-বস্ত্র, আরো দিয়েছিল নিরাপদ বাসস্থান,
কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তাদের অবদান)।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোঃ আবদুল হামিদ পুনঃনির্বাচিত

দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত বর্তমান রাষ্ট্রপতি হয়েছেন মোঃ আবদুল হামিদ। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নুরুল হুদা তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। নির্বাচিত ঘোষণার পরই বিকেলে এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। তিনি দেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। আগামী ২৩ এপ্রিল দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি শপথ গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রপতি আইন ১৯৯১-এর ৭ ধারা অনুযায়ী অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে পুনঃনির্বাচিত ঘোষণা করা হয় বলে জানান সিইসি।

ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে

২৪ জানুয়ারি ভোলার চরফ্যাশনে জ্যাকব ওয়াচ টাওয়ার, চরকুকরি-মুকরি পর্যটন কেন্দ্র এবং ইকোপার্কসহ ৭টি স্থাপনা উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। উদ্‌বোধনের পর বিকেলে চরফ্যাশন টিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিভিন্ন দেশে ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে। সে চিন্তাধারা থেকে এ চরফ্যাশনে জ্যাকব ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করেছে চরফ্যাশন পৌরসভা।

তিনি বলেন, ভোলা একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা। পাহাড়ি ঢলের পলিবালি এসে এ অঞ্চলের সাগর মোহনায় চরের সৃষ্টি হয়। এই যে চরকুকরি-মুকরির সৃষ্টি হয়েছে, চরফ্যাশন এখন উন্নয়নের কারণে ফ্যাশনেবল চরে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেশি। জমি খুব কম। আমরা যদি সাগর মোহনায় পলিবালি জমে যে চর পড়ে সেগুলোর সংযোগ এবং ওয়াল করে দেই, চরে চরে ক্রসড্যাম দেই, তাহলে বাংলাদেশ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকারকে চিন্তা করতে হবে।

চরফ্যাশনের পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটের প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এখানকার বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের চিত্র দেখে আমি আনন্দিত, অভিভূত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই চরফ্যাশন। চরফ্যাশনের আবহাওয়ার সঙ্গে আমার হাওর এলাকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অনেক মিল রয়েছে। তাই এখানে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছি। এ অঞ্চলের ঐতিহ্য কৃষি, মৎস্য, নদী। এখানে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪ শে জানুয়ারি ২০১৮ ভোলাজেলার চরফ্যাশন উপজেলায় 'জ্যাকব টাওয়ার' উদ্‌বোধন শেষে টাওয়ার পরিদর্শন করেন-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৩ দিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী নিত্যনতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সভ্যতার চাপে মাতৃভাষা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাহিত্যের অন্বেষণ মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন এবং যৌক্তিকতাবোধকে শানিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত থেকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সাহিত্য মানুষকে যুক্তিবাদী ও সংবেদনশীল করে তোলে। বহুমাত্রিক সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক করে। তাই সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-১৪২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন-পিআইডি

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ জানুয়ারি হোটেল সোনারগাঁও -এ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী সমৃদ্ধির পথযাত্রায় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশকে অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আসন্ন সমস্যার প্রতি আরো মনোযোগ দিতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে নির্মিত ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ জানুয়ারি সোনারগাঁও হোটেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন নাগরিক সেবা দিতে ৪ হাজারতম পাড়াকেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি রাঙামাটির এক শিশুর সাথে কথা বলেন এবং 'চিটাগাং হিল ট্রাক্টস জার্নি টুয়ার্ডস পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়িতে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১-এর কথা পুনরোল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর কথাও উল্লেখ করেন।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের ভাষা, নিজেদের শিল্প-সাহিত্য যদি আমরা মর্যাদা দিতে না পরি, তার উৎকর্ষ সাধন করতে না পারি, তাহলে জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে আমরা আরো উন্নত হতে পারব না। এলক্ষ্যে তিনি নিজ দেশের ভাষা ও কৃষ্টি, শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে মর্যাদা প্রদানের আহ্বান জানান। পরে তিনি 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭' প্রদান করেন। এছাড়া বাংলা একাডেমির সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান এবং মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান প্রধানমন্ত্রীকে 'আলোকচিত্রে বাংলা একাডেমির ইতিহাস' এবং 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক দুটি বই উপহার দেন।

দশম ইসলামিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ ফেব্রুয়ারি সোনারগাঁও হোটেলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-র পর্যটনমন্ত্রীদের দশম ইসলামিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হোটেল সোনারগাঁওয়ে 10th Session of the Islamic Conference of Tourism Ministers এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় ডিএসসিএসসি ২০১৭-১৮ কোর্সের গ্রাজুয়েটদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী পর্যটন একটি দ্রুত বিকাশমান খাত, যা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পর্যটন শিল্প অন্যতম ক্ষেত্র, যেখানে একসঙ্গে কাজ করার বড়ো সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস, বুঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে।

সশস্ত্রবাহিনী দক্ষ ও চৌকস বাহিনী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের ২০১৭-১৮ কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে সশস্ত্রবাহিনী অনেক বেশি উন্নত, দক্ষ ও চৌকস। তারা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবিলায়ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়নে নেওয়া তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। পরে তিনি ২৬৬ জন গ্র্যাজুয়েটকে সনদ প্রদান করেন এবং তাদের অভিনন্দন জানিয়ে এ প্রশিক্ষণ অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন এবং যে-কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরো আত্মপ্রত্যয়ী হতে শেখাবে বলে উল্লেখ করেন।

বরিশালে ৩৯টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৩৩টির ভিত্তিফলক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল সফর করেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে পটুয়াখালীর লেবুখালীতে যান এবং শেখ হাসিনা সেনানিবাস-এর উদ্‌বোধন করেন ও ৭ পদাতিক ডিভিশনসহ ১১টি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে তিনি দুপুরে বরিশালে বঙ্গবন্ধু উদ্যানে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল বিভাগের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন এবং ৩৯টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৩৩টির ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

গণমাধ্যম থেকে হলুদ সাংবাদিকতা নির্মূলের আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি)-এর সম্মেলন কক্ষে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (এমআরডিআই) এবং পিআইবি'র যৌথ আয়োজনে 'সংবাদবোধ ও পাঠকের ধারণা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, সংবাদপত্র জনগণের কণ্ঠস্বরের পত্র, কখনোই তা ভীতি পত্র, উস্কানি পত্র বা চরিত্রহনন পত্র নয়। গণমাধ্যম জনগণের কথা বলবে, জনগণকে প্রতারিত করবে না।

তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের অধিকার আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে যে সামরিক- সাম্প্রদায়িক চক্র রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে। তাদের ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দমন করতে হবে। একইভাবে গণমাধ্যম থেকেও হলুদ সাংবাদিকতা নির্মূল করতে হবে।

বাঙালিয়ানা চর্চা করুন, আলোকিত মানুষ হোন

তথ্যমন্ত্রী ২০ জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এক্সপো ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বাঙালিয়ানা চর্চা করুন, নিজস্ব সত্তা ধারণ

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১১ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় পিআইবি মিলনায়তনে 'সংবাদবোধ এবং পাঠকের ধারণা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

করে গর্বিত আলোকিত মানুষ হোন, মন্ত্রী আরো বলেন, বিদেশি ভাষা শিখুন, কিন্তু শুদ্ধভাবে বাংলাচর্চায় যত্নবান থাকুন। চার হাজার বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস- ঐতিহ্য আমাদের গর্বিত বাঙালির পরিচয়। একে ধারণ করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে চলার মধ্যেই জীবন ও শিক্ষার মাহাত্ম্য নিহিত।

সংবাদ প্রকাশে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৬ জানুয়ারি টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের নবর্নিবাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের পরিচিতি অনুষ্ঠানে ২০১৮-১৯-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা, বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং আমাদের ইমেজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো একটি মেয়াদের জন্য বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আসার প্রয়োজন আছে।

তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকারের পক্ষে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের উন্নয়ন, দেশের প্রবৃদ্ধিসহ সবকিছুর সূচক এ সরকার একটি সম্মানজনক আবস্থানে নিয়ে গেছে। দেশের উন্নয়নের চাকা যেভাবে সামনের দিকে ঘুরছে কোন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তা যেন পিছনের দিকে ঘুরে না যায়, সেদিকে সকলকে লক্ষ রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, দেশের ক্ষতি হয়, দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং দেশের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে সর্বাগ্রে। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণে মানের উন্নয়নের প্রাধান্য সুপারিশে নয়

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৬ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে ঢাবি'র টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, টিভি অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নকেই সবার আগে বিবেচনা করতে হবে, সুপারিশে নয়। বিটিভিসহ সকল টেলিভিশনই তা বজায় রাখলে দেশের গণমাধ্যমের উন্নয়ন হবে, উপকৃত হবে জাতি।

চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীরাও যাতে সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ পায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী সেজন্য প্রস্তাব উত্থাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত

তথ্যসচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ ২১ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ৩৫তম বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃত্য করেন-পিআইডি

করলে বিভাগের সকলে তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

শীঘ্রই নবম ওয়েজ বোর্ড ও সম্প্রচার আইন আসছে জানিয়ে তারানা হালিম সংবাদপত্রের বিষয়ে বলেন, অষ্টম ওয়েজ বোর্ড রয়েছে। সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে। তাই তিনি তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে সংবাদপত্র মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উন্নয়নের অন্যতম মডেল জেলা হবে টাঙ্গাইল

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৮ জানুয়ারি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ উদ্যোগের প্রচার এবং টাঙ্গাইল জেলার উন্নয়ন' শীর্ষক ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, টাঙ্গাইল জেলার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে তাঁতপল্লী স্থাপন, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে তোলা ও ঢাকার সাথে দ্রুতগামী কমিউটার ট্রেন চালু করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুসারে 'জেলা ব্রান্ডিং'-এর ক্ষেত্রে তাঁতের শাড়িই হবে টাঙ্গাইল জেলার পরিচায়ক এবং জেলাটি অচিরেই হবে ভিক্ষুকমুক্ত। আর এভাবেই উন্নয়নের অন্যতম মডেল জেলা হবে টাঙ্গাইল।

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন

১ জানুয়ারি : ২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামালকে ২০১৮ সালের 'প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার' বা 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী

বই উৎসব

সারা দেশে ৪ কোটি ৭৩ লাখ ৬ হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬টি বই বিতরণ করে 'বই উৎসব' পালন করা হয়।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস

২ জানুয়ারি : রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষ, সমাজসেবায় গড়ব দেশ'। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটি উপলক্ষে সমাজসেবা মেলা উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বার্ণিজ্য মেলা-২০১৮ এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন-পিআইডি

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার জনবান্ধব, নারীবান্ধব, কৃষিবান্ধব, বিনিয়োগবান্ধব বিধায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ২০০৬ সালের বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতি আজ ১০ গুণ, মাথাপিছু আয় ৫০০ থেকে আজ ১৬০০ মার্কিন ডলারের বেশি। প্রধানমন্ত্রীর দশ বিশেষ উদ্যোগ, বিশেষ করে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। প্রতিদানে সকলকে একাগ্রচিত্তে কাজ করতে হবে।

৩৫তম বিসিএস তথ্য ফাউন্ডেশন কোর্স উদ্‌বোধন করলেন তথ্যসচিব

তথ্যসচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ ২১ জানুয়ারি দারুস সালামে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ সংস্থা পরিচালিত বিসিএস তথ্য ফাউন্ডেশন-এর ৩৫তম কোর্সের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে তিনি বলেন, বর্তমান যুগ তথ্য প্রবাহের যুগ এবং এক্ষেত্রে দেশ ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

একনেকে ১৬ প্রকল্প অনুমোদন

শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় 'পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা' প্রকল্পসহ প্রায় ৫ হাজার ২২১ কোটি টাকার মোট ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৩ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

৪ জানুয়ারি : গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফেনীর মহীপাল ছয় লেন ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১২ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সাফ অনুর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী বাংলাদেশ ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দেন।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮

৮ জানুয়ারি : রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

একনেকে ১২ হাজার কোটি টাকার ১৪ প্রকল্প অনুমোদন

৯ জানুয়ারি : শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৩২৫০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন সম্প্রসারিত প্রকল্পসহ ১২ হাজার ৪১৬ কোটি টাকার মোট ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

১২ জানুয়ারি : জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ৯ দিনের এ উৎসবে প্রদর্শিত হয় স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ৬৪টি দেশের ২১৬টি চলচ্চিত্র। এ উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'ভালো ছবি ভালো দর্শক, সমৃদ্ধ সমাজ'।

প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সরকারের চার বছর পূর্তিতে দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-এর উদ্‌বোধন

১৩ জানুয়ারি : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৪২৪'-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব ইজতেমা

১৪ জানুয়ারি: টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্ব সম্পন্ন হয় ২১ জানুয়ারি।

জাতীয় সবজি মেলা

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে তিনদিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলার উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নৌপরিবহণমন্ত্রী শাজাহান খান। মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল– 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, অর্থ আসে'।

মন্ত্রিসভায় রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা অনুমোদন

১৫ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর

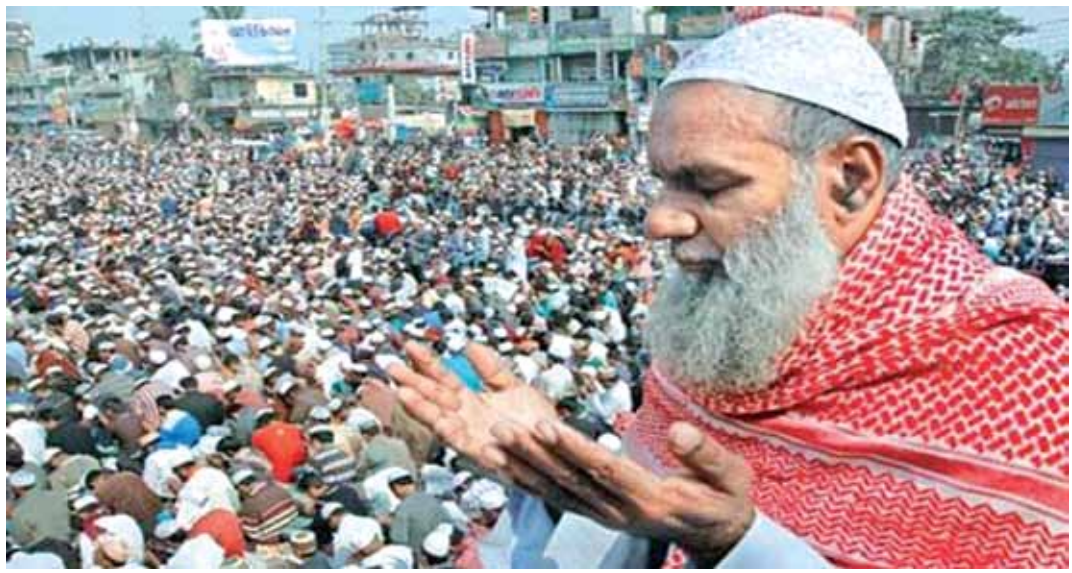

বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা'র খসড়া অনুমোদন লাভ করে।

একনেক সভায় ১৪টি প্রকল্পের অনুমোদন

১৬ জানুয়ারি : শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ৪টি সহ মোট ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্‌বোধন

১৭ জানুয়ারি : সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী সমৃদ্ধির পথযাত্রায়, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে দাতা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

একনেকে ১৪ প্রকল্প অনুমোদন

২৩ জানুয়ারি: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পসহ মোট ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

পিঠা উৎসব

জাতীয় পিঠা উৎসব

শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় পিঠা উৎসব'। শিল্পকলা একাডেমি ও জাতীয় পিঠা উৎসব পরিষদ যৌথভাবে এ উৎসবের আয়োজন করে।

বেপজা সম্মেলন উদ্‌বোধন

২৪ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বেপজা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন ২০১৮' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২৬ জানুয়ারি : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'A Secure Business Environment For Economic Development'

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ভাষাশক্তি সূচকে এগিয়ে বাংলাদেশ

বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে পাকিস্তান, ভাষাশক্তির বৈশ্বিক সূচকে তারা বাংলাদেশের চেয়ে এখন ১৫ ধাপ পিছিয়ে আছে। ফ্রান্সভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইনসিয়েড'-এর সম্মানিত ফেলো ড. কাই এল চানের তৈরি 'পাওয়ার ল্যাংগুয়েজ ইনডেক্স-পিএলআই-২০১৬' এ তথ্য দিয়েছে। মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৩০তম।

ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সূচকেও বাংলাদেশ ৬ ধাপ এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তানের তুলনায়। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক 'ইএফ ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি ইনডেক্স-২০১৭' অনুযায়ী ইংরেজি মূল ভাষা নয় এমন ৮০টি দেশের র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৪৬তম আর পাকিস্তানের অবস্থান ৫২ তম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এমআইএল ইন্টারন্যাশনালের তথ্য ব্যবহার করে তৈরি 'ইথনোলগ' এর এক প্রতিবেদনেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর চেয়ে বাংলাকে অনেক শক্তিশালী ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর ২য় স্প্যান : কেটে গেল বাধা

বছরের শুরুতেই দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতুর ২য় স্প্যান। ৩৮ ও ৩৯ নং পিলারের ওপর বসানো হলো স্প্যান ৭বি (সুপার স্ট্রাকচার)। ধূসর রঙের ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩১৪০ টন ওজনের স্প্যানটি খুঁটিতে লেগে যাওয়ার পর পদ্মা সেতু এখন ৩০০ মিটার দৃশ্যমান হচ্ছে। ১ম স্প্যানটি বসেছিল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭। এই একেকটি স্প্যান যেগুলো জোড়া দিয়ে হবে পুরো ৬.১৫ কিলোমিটার স্বপ্নের পদ্মা সেতু। ২৯ জানুয়ারি স্প্যানটি পিলারের ওপর নেওয়া হয়। এরপর চলে সেট করার প্রক্রিয়া। স্প্যান বসানোর আগে ওয়েট টেস্ট, বেজ প্লেট, দৈর্ঘ্য, পাইল পজিশন, ট্রায়াল লোড টেস্ট, মেজারমেন্টসহ আনুষঙ্গিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে উঠবে বাকি স্প্যান। তৃতীয় স্প্যানও প্রায় প্রস্তুত। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ৩৯ ও ৪০ নম্বর পিলারের ওপর ওঠানো হবে ৩য় স্প্যান।

৯০ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ

বিদ্যুত পরিস্থিতি নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এক জরিপ করে । এই জরিপের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই-ইলাহী ২২ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বিবিএস গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৮৯ ভাগ মানুষের ঘরে

পদ্মা সেতুর মডেল

বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পরিকল্পনায় ৭৯.৭ ভাগ মানুষ আস্থা রাখছে। ৫.৬ ভাগ মানুষ আস্থা রাখছে না, ১৪ ভাগ মানুষের এনিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। জরিপ চালানো মানুষের ৭৩ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর বাকিরা পৌর এবং সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা। এই জরিপ সরকারের আরো নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

সুষম উন্নয়ন সূচকে এগিয়ে বাংলাদেশ

বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর সুষম উন্নয়ন সূচকে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) সংস্থাটির প্রকাশিত 'সুষম প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির ৭৯টি দেশের তালিকায়–ভারত ৬২তম ও পাকিস্তান ৪৭তম অবস্থানে রয়েছে। প্রতিবেশি এ দুই দেশকে পেছনে ফেলে ৩৮তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। জীবনযাত্রার মান, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও ঋণ থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার ওপর ভিত্তি করে বৈশ্বিক এ সূচক প্রকাশ করেছে ডব্লিউইএফ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশের মধ্যে একমাত্র নেপাল রয়েছে বাংলাদেশের উপরে। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। এরপর আছে আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক।

নামফলক বাংলায় লিখতে হবে

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামফলক , সাইনবোর্ড, ব্যানার ও বিলবোর্ড বাংলায় লেখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দূতাবাস, বিদেশি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশনার বাইরে থাকবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন ১৬৯/২০১৪ প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী, সকল প্রতিষ্ঠানের (দূতাবাস, বিদেশি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত) নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার ইত্যাদি বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় লেখা হয়েছে। তাদের নিজ উদ্যোগে প্রজ্ঞাপন জারির সাতদিনের মধ্যে সেগুলো বাংলায় লিখে প্রতিস্থাপন করতে হবে। না হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

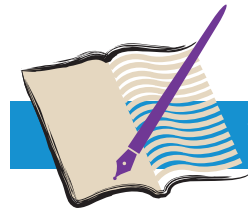

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

তিন হাজার মাধ্যমিক স্কুল ভবন নির্মাণ করার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জানুয়ারি শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী ৩০০০ মাধ্যমিক স্কুল ভবন নির্মাণ করার আশ্বাস দেন। এবং ১৪ প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

বেসরকারি ভার্সিটিতে টিউশন ফি কমানোর তাগিদ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০ জানুয়ারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ব্যয়সীমা বা টিউশন ফি কমানোর তাগিদ দেন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে তিনি ৯৬২ জন শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি এবং কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ৪ জন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা বাড়ানোর আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৮ জানুয়ারি তেজগাঁও-এ সরকারি বিজ্ঞান কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন এবং সরকারি বিজ্ঞান কলেজকে ভালো বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন-পিআইডি

দুই হাজার নতুন মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের আশ্বাস

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৭ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মোদারেছীন আয়োজিত মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণকালে মন্ত্রী সারা দেশে ২ হাজার মাদ্রাসায় আধুনিক চারতলা ভবন নির্মাণের আশ্বাস দেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম, ন্যায়নীতির ধর্ম এবং কল্যাণের ধর্ম। এর ভুল ব্যাখা দিয়ে কেউ যাতে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে না পারে সেজন্য আলেম-ওলামাদেরকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পকলার প্রদর্শনী

পঁয়ত্রিশটি দেশের শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে বাংলাদেশের বৃহৎ দ্বিবার্ষিক শিল্প সম্মেলন ঢাকা আর্ট সামিট নানা পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পকলার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এদিন শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে 'ঢাকা আর্ট সামিটে'র উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

শিল্প ও স্থাপত্যকে ব্যতিক্রম আঙ্গিকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক এ শিল্প সম্মেলনের উদ্যোগ নেয় সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশন। শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় এ বছর চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলন। অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি।

চিত্তরঞ্জন সাহার দশম প্রয়াণবার্ষিকী

প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩২টি বই দিয়ে শুরু করেছিলেন একটি মেলা। দিনে দিনে তা হয়ে উঠে মহিরুহ। সেই মেলাটিই আজ একুশে বই মেলা। একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার দশম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার আয়োজন করে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি।

'আগুনের পরশমনি' ও 'আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে' গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে সরকারি ও বেসরকারি মোট ৪২টি স্টল স্থান পায়।

কলকাতা বইমেলা

পৌষ সংক্রান্তি

বাঙালির পিঠাপুলির উৎসব

পৌষ সংক্রান্তি হলো সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পিঠা-পায়েসের উৎসব। প্রতি বছর বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি দিন ঐ উৎসব পালন করা হয়। এই সংক্রান্তি তিল সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি নামেও পরিচিত। এর আমেজ মাঘ মাসের সম্পূর্ণ প্রথম সপ্তাহ জুড়ে চলতে থাকে। এই সংক্রান্তি উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি নানা রকম পিঠাপুলি তৈরির ধুম লেগে যায় একদিন আগে থেকেই। বাড়ির মহিলারা চালেরগুড়ি, ডাল, আলু, নারিকেল, মরিচাগুড়, খেজুরেরগুড়, চিনি, বাঁধাগুড় ইত্যাদি দিয়ে নানা জাতের পিঠাপুলি তৈরি করেন। এজন্য একে পিঠাপুলির সংক্রান্তিও বলা হয়।

সংক্রান্তির আগের রাতে ছন বা নাড়া দিয়ে ভেড়া-ভেড়ির ঘর তৈরির রেওয়াজ আছে। ছোটো ছোটো শিশু, বালক-বালিকা, যুবক দল বেঁধে এই ঘর তৈরি করে। এই ঘরে তারা রান্না-বান্না করে এক ধরনের বন-ভোজন পাতিয়ে বসে। একে টুপাটুপি বলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা সারারাত জুড়ে গান-বাজনাসহ মজা করে কাটায়। কেউ কেউ মাইকের বা সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করে থাকে। রাতজুড়ে তারা এভাবে উজাগর করে ভোরে ভেড়া-ভেড়ি ঘরের সন্নিকটের পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে এক সাথে স্নান করে এ ভেড়া-ভেড়ির ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আগুন পোহায় এবং আনন্দ উপভোগ করে। তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে পূজা- অর্চনা সেরে বাড়ি বাড়ি বেড়াতে যায়। বালক-বালিকাদের মাঝেই এর প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনে সবার ঘরেই পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকে।

দুপুরের আগেই সবাই সংকীর্তন করার জন্য কোনো দেব বা দেবী মন্দিরের সামনে সমবেত হন।

বিশেষ করে গ্রামের বা মহল্লার বা পাড়ার সর্ব পূর্ব প্রান্তের বাড়ি থেকেই এই কীর্তন শুরু করে সর্ব পশ্চিমের বাড়িতে বা কোনো দেবতা গাছের তলায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐ দিন কীর্তনের সময় প্রত্যেকের বাড়িতেই লুট প্রসাদ বিতরণ করা হয়। লুটের জিনিসের মধ্যে রয়েছে- কদমা, বাতাসা, নকুল, নারিকেল, কলা, খিরা, আপেল, কমলা ইত্যাদি নানা মিঠাই ও ফল-ফলানী। সারাদিন উৎসবের আমেজ মেতে থাকে প্রতিটি পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। বাড়ির মা-বোনেরা কীর্তন আসার আগেই আঙিনা জুড়ে চালেরগুড়ি ও নানা রকম রঙ দিয়ে নকশা আঁকেন।

সংক্রান্তি উপলক্ষে বাড়ির মেয়েরা স্বামী-সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং অতিথিদের আগমন ঘটে। এই গমন-আগমন এবং বেড়ানো ও পিঠা-পায়েস খাওয়া চলে প্রায় মাঘ মাসের প্রায় প্রথম ৭-৮দিন ধরে। কোনো কোনো এলাকায় পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা কিছিমের মেলার। বিশেষ করে মাছ মেলার আয়োজন হয়। মেলায় বড়ো বড়ো মাছ মেলার মূল আকর্ষণ। সবাই প্রতিযোগিতা করে মাছ কেনে। কার চেয়ে কে বড়ো মাছ কিনতে পারে এ প্রচেষ্টা থাকে ধনী-গরিব সকল জনসাধারণের মধ্যে। মৌলভীবাজার জেলার শেরপুরের মাছমেলা ঐতিহ্যে রূপ নিয়েছে।

বর্তমানে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রত্যেকের বাড়িতে পিঠা তৈরি, খাওয়া, বিলানো এবং মেলায় যাওয়া সব ধর্মের, সব মতের মানুষের মিলনে পূর্ণতা পেয়েছে; ফলে পৌষ সংক্রান্তি রূপ নিয়েছে বাঙালির পিঠাপুলির উৎসবে।

প্রতিবেদন: পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

সরকারি স্টলগুলো হলো- বাংলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর। এবারের ৪২তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ দিবস হিসেবে মেলা কর্তৃপক্ষ ৩রা ফেব্রুয়ারিকে নির্ধারণ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুমোদন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের (আইসিটি) বিতর্কিত ৫৭ ধারাসহ কয়েকটি ধারা বিলুপ্তির বিধান রেখে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। অপব্যবহার রোধে নতুন আইনে ৫৭ ধারাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৮-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে জানা যায়, নতুন আইন পাস হলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৬৬ ধারা বিলুপ্ত হবে। এর বদলে নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এসকল ধারার বিস্তারিত ব্যাখাসহ অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে।

২০১৬ সালের ২২ আগস্ট ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন পায়। সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, '৫৭ ধারায় সব ছোটো করে লেখা ছিল। সেটা বিস্তারিত ব্রেকআপ দিয়ে দিয়ে যেটা যে প্রকৃতির অপরাধ সেই আঙ্গিকে শাস্তি বেশি হলে বেশি কম হলে কম। তদন্ত কীভাবে করা হবে সেটা ডিটেইল বিস্তারিত করা হয়েছে, যেটা আগে ছিল না।' এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের জন্য খসড়ায় সর্বোচ্চ ১৪ বছর জেল এবং এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের কয়েকটি ধারায় শাস্তির বিধান আছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার অপব্যবহার বিশেষ করে এ ধারায় সাংবাদিকদের নামে মামলার কারণে এ ধারাটির বিরুদ্ধে সমালোচনা ওঠে। তখন ধারাটি বাতিলের দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে ।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শতভাগ ইন্টারনেট

১৯ জানুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লিতে গ্লোবাল সাইবার স্পেস কনফারেন্স ২০১৭-এর 'ব্রিজিং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড-এমপাওয়ারিং বাই টেকনোলজি লেড ইনক্লুসিনেস'

১৯ শে জানুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লিতে গ্লোবাল সাইবার স্পেস কনফারেন্স ২০১৭ এর 'ব্রিজিং দা ডিজিটাল ডিভাইডএমপাওয়ারিং বাই টেকনোলজি লেড ইনক্লুসিনেস' শীর্ষক প্লেনারি সেশনের আলোচনা সভা

শীর্ষক প্লেনারি সেশনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, ২০২১ সালের মধ্যে সারাদেশকে শতভাগ ইন্টারনেট সংযোগ ও ৫০ শতাংশ ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় নিয়ে আসতে বর্তমান সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও তাঁর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টার নির্দেশনায় বাংলা গভনেট, ইনফো সরকার-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনে ডিজিটাল বাংলাদেশের নানামুখী কর্মকান্ড উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, প্রযুক্তি বৈষম্য হ্রাস করতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-'ডিজিটাল অবকাঠামো ও সেবা প্রদান সহজলভ্য করা, সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা এবং ডিজিটাল যন্ত্র ও অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করা। এভাবে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার এর গবেষণা ও উন্নয়ন খাত থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে সক্ষম হবো। এ সম্মেলনে ২০টি দেশের মন্ত্রী ও ১৩টি দেশের আলোচকরা বিভিন্ন সেশনে অংশ নেন বলে সরকারের আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

নজর কাড়া সবজি মেলা

রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে ১৪ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজন করা হয় নজর কাড়া সবজি মেলা। ব্রোকলি, পার্সলে, ক্যাপসিকাম, শতমূলী, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, গাজর, মুলা, আলুসহ প্রায় ১০৪ রকমের সবজির পসরা ছিল মেলায়। 'সারা বছর সবজি চাষে/পুষ্টি-স্বাস্থ্য, অর্থ আসে'- স্লোগানকে সামনে রেখে সরকারি-বেসরকারি অর্ধশতাধিক কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজন করে এই মেলার।

সবজি মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্লাইউড দিয়ে তৈরি করা পিরামিড। পিরামিডের গায়ে তাক করে বসানো হয়েছে দেশজ মৌসুমি বিভিন্ন সবজি। দূর থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সবজি পিরামিড।

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, জাতীয় সবজি মেলা সবার মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সবজি উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই মেলায় প্রায় ৬০ লাখ টাকার সবজি বিক্রি হয়েছে।

প্রণোদনা দেওয়া হবে মসলা চাষে

পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় মসলার চাষ দেশের যেসব জেলায় বেশি হয় সেখানকার কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়া এবং ঘাটতি পূরণে ও দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ নির্দেশ দেন তিনি। একনেক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান, সারাবিশ্বে ১০৯ প্রকার মসলা চাষ করা হলেও বাংলাদেশে প্রায় ৪৪ জাতের মসলা ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে চাষ করা হয় মাত্র ৩৪টি। এজন্য মসলার চাষ বাড়াতে গবেষণা জোরদারের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 'বাংলাদেশ মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়ে ৯৪ কোটি টাকা।

রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ চত্বরে নজরকাড়া সবজি মেলা

পাস হলো বীজ বিল

বীজ বিল ২০১৮ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে বিলটি পাসের জন্য উত্থাপন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। বিলটির ওপর আনীত জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর কণ্ঠভোটে তা পাস হয়। তবে তার আগে জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়। বিলের ওপর আনা ১২টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে সংসদ ফখরুল ইমামের একটি প্রস্তাব গ্রহণ ও ১১টি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ করা হয়।

বিল পাসের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রয়, মাননিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানি এবং কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের জন্য সিড অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ রহিতক্রমে সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় বাংলা ভাষার বীজ আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের ৪২ মহাসড়ক প্রশস্ত করার উদ্যোগ

প্রতিবছরই যানবাহনের চাপ বাড়ছে। ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যান চলাচলে নিয়মিতই দুর্ঘটনা ঘটছে। এমনি পরিস্থিতিতে দেশের মোট ৪২টি মহাসড়ককে প্রশস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। আর্থসামাজিক গুরুত্ব অনুসারে ১০ জোনের ৪২টি সড়ক সমানভাবে ২৪ ফুটে উন্নীত করা হচ্ছে। সব সড়কের বর্তমান প্রশস্ততা ১২ থেকে ১৮ ফুট। সড়কগুলোর মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ১৪০ কিলোমিটার। সেকারণে মোট ১০টি জোনে গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গুচ্ছ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। ১০ জোনের মধ্যে ৮টি প্রকল্প ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদিত হয়েছে। বাকি দু'টিও অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম জোনের কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শেষ করা হবে।

দেশের মোট সড়কের প্রায় ২০ শতাংশই আঞ্চলিক মহাসড়ক। বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ জোনে বিভক্ত করে আঞ্চলিক মহাসড়ক পরিচালিত হয়। ১০টি জোনে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে মোট আঞ্চলিক সড়ক রয়েছে ১২৬টি। সব মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ২৪৭ কিলোমিটার। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মহাসড়কে নিরাপদ গাড়ি চলাচলে ন্যূনতম সাড়ে ১১ ফুট জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় থাকা সড়কগুলোর বর্তমান প্রশস্ততা ১২ থেকে ১৮ ফুট। এই সড়কগুলো শুধু প্রশস্ত করলেই হবে না। সড়কের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিতসহ প্রশস্ত করার সুবিধা পেতে হলে ভূমির সমন্বিত ব্যবহারের পাশাপাশি রক্ষাণাবেক্ষণের দিকেও নজর দিতে হবে। দেশের মহাসড়কের মোট ১ হাজার ১৪০ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণের পাশাপাশি ৭৮১ কিলোমিটার মজবুত করা হবে। তার বাইরে ১৯ কিলোমিটার রিজিভ পেভমেন্ট, ৩৭টি সেতু, ১৩৪টি কালভার্ট, ১৮টি বাস-বে ও ৯টি ইন্টারসেকশন নির্মাণ করা হবে। ঢাকা জোনের ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৩৪ দশমিক ২ কিলোমিটার যথাযথ মান প্রশস্ততায় উন্নীত করতে ব্যয় হবে ৫৯১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সিলেট জোনের ৬টি আঞ্চলিক সড়কের ১৪৮ দশমিক ৭৬ কিলোমিটার মানোন্নয়নে ব্যয় হবে ৫৬৪ কোটি ১২ লাখ

টাকা। বরিশাল জোনের ৬টি সড়কের ১৩০ দশমিক ১২ কিলোমিটারের জন্য ব্যয় হবে ৫২১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। ময়মনসিংহ জোনের চার জেলার ১৫১ দশমিক ৫২ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্ত করতে ব্যয় হবে ৬০৫ কোটি ৪২ লাখ টাকা। কুমিল্লা জোনের চার জেলার ১৬৮ দশমিক ৬৩ কিলোমিটার সড়ক ২৪ ফুট প্রশস্ত করতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। খুলনা জোনের চার জেলার ১২৬ দশমিক ৭৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক প্রশস্তকরণে ব্যয় হবে ৫৯৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। রংপুর জোনের চারটি জেলার ১০৫ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ব্যয় হবে ৫৯৮ কোটি টাকা। রাজশাহী জোনের ২টি জেলার ৭৪ কিলোমিটার রাস্তার মানোন্নয়নে ৪৩৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা এবং গোপালগঞ্জ জোনের ২টি জেলার ৫১ দশমিক ৬৯ কিলোমিটার রাস্তায় ব্যয় হবে ৩৯৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকা।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে সরকার। এক্ষেত্রে সড়কগুলো প্রশস্ত করা কাজ শেষ হলে দেশের আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক আরো বেশি শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক সড়কগুলো যেহেতু দেশের জেলা সদর ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের সংযোগ ঘটিয়েছে তাই প্রশস্তকরণের কাজ শেষ হলে দেশের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধিতেও সড়কগুলো ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) রপ্তানি আয় হয়েছে ১ হাজার ৭৯১ কোটি ৬০ লাখ ডলার। আর গত অর্থবছরের একই সময় যা ছিল ১ হাজার ৬১০ কোটি ১০ লাখ ডলার অর্থাৎ সে তুলনায় রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। গত ছয় মাসের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১ হাজার ৭৮৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এসময় রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ০.২৩ শতাংশ বেশি অর্জিত হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

ইপিবি'র সূত্র মতে, চলতি অর্থবছরের গত ছয় মাসে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৭.৭৫ শতাংশ। এসময় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১ হাজার ৪৩৭ কোটি ৬২ লাখ ডলার। আর রপ্তানি আয় হয় ১ হাজার ৪৭৭ কোটি ২৭ লাখ ডলার। এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৭৬ শতাংশ বেশি। নিট পোশাক রপ্তানি থেকে এসময় আয় হয়েছে ৭৫৯ কোটি ৫২ লাখ ডলার, এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫.৫২ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭১৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার।

তাছাড়া চলতি অর্থবছরের গত ছয় মাসে অন্যান্য প্রধান খাতগুলোর মধ্যে হিমায়িত এবং জীবন্ত মাছ রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩১ কোটি ২৪ লাখ ডলার। এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২২.৫২ শতাংশ বেশি। আর গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৭.১৭ শতাংশ বেশি। কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩১ কোটি ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ শতাংশ এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি।

জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বর্তমান সরকার জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। ২৫ জানুয়ারি আইডিইবি'র মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে বিসিআইসি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন ২০১৮-এর উদ্‌বোধনকালে তিনি এ তথ্য জানান।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা শিল্পায়নের মূল কারিগর। জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প উৎপাদন বাড়াতে পর্যাপ্ত কারিগরি জনবল প্রয়োজন হবে। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকার কাকরাইলে বিসিআইসি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির জাতীয় সম্মেলন ২০১৮ এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন-পিআইডি

কারিগরি জনবল তৈরির লক্ষ্যে টিটিসি চালু করা হয়েছে। তাছাড়া নারীদের জন্য পৃথক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। বিসিআইসিতে কর্মরত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য পেশাগত সমস্যার সামাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল পণ্যসামগ্রী

দেশের তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল পণ্যসামগ্রীও রপ্তানিতে ভালো অবস্থানে রয়েছে। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি, যথাসময়ে জাহাজীকরণ, মান ধরে রাখা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে বিশ্ববাজার, বিশেষত ইউরোপের ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করছে বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল পণ্যসামগ্রী।

সম্প্রতি ইউরোপের দেশ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে হোম টেক্সটাইলের সবচেয়ে বড়ো প্রদর্শনীর আয়োজন করে মেসে ফ্রাঙ্কফুর্ট। 'হিমটেক্সটিল' নামে ওই প্রদর্শনীতে সারাবিশ্ব থেকে ২ হাজার ৯৭৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আর ১৩০টি দেশের প্রায় ৭০ হাজার ক্রেতা-বিক্রেতা উপস্থিত হন ওই প্রদর্শনীতে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও ১৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। তারা জানান, হোম টেক্সটাইলের বিশ্ববাজার বড়ো হচ্ছে। আগামীতে এ জাতীয় পণ্যসামগ্রী রপ্তানির সম্ভবনাটাও অনেক রয়েছে আমাদের। সরকারের নীতি সহায়তা পেলে দ্রুত বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি দ্বিগুণ করা সম্ভব।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধারা পাঁচটি বোনাস পাবে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে দু'টি বোনাস দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে পাঁচটি বোনাস দেওয়া হবে। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও পহেলা বৈশাখে বোনাস পাবে মুক্তিযোদ্ধারা।

মন্ত্রী ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার লক্ষ্যারচর মরহুম মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন বাঙালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

২৮ লাখ ১০ হাজার কম্বল ও ৮০ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার শীতার্তদের মাঝে বিতরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম বলেছেন, সরকার শীতার্ত দুস্থ মানুষের জন্য ২৮ লাখ ১০ হাজার কম্বল ও ৮০ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডার থেকে ১৮ লাখ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে দেশে চলমান শৈত্য প্রবাহ মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।

অসচ্ছল ৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধারা বাসস্থান পাবেন।

প্রায় ৩ হাজার ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পাচ্ছেন বাসস্থান। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৩টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করছে সরকার। দেশের ৪২২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১০ সালে ৪১ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তিন বছর (২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৩ সালের জুন)। এক বছর পরই প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এক বছর বাড়িয়ে ২০১৪ সালের জুন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। সরকার ৪১ জেলার পরিবর্তে ৬৪ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল তিন বছর বাড়িয়ে ২০১৭ সালের জুন করা হয়। বর্তমানে এই মেয়াদ আরেক দফা বাড়িয়ে ২০১৮ সালের ৩০ জুন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মইনুল হক আনসারী বলেন, বর্তমান সরকার ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করছে। প্রথম পর্যায়ে ২ হাজার ৯৭১টি বাসস্থান নির্মাণ করা হবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহম্মেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

এগিয়ে চলছে মেট্রোরেলের কাজ

রাজধানী ঢাকাকে যানজটমুক্ত করতে এবং নগরবাসীর সময় বাঁচাতে স্বপ্নের মেট্রোরেলের কাজ চলছে। বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের মধ্যেই এমআরটি লাইন ৬-এর একাংশের কাজ শেষ করতে চায়। উত্তরা তৃতীয় প্রকল্প থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যে এখন জোরেশোরে কাজ চলছে। সরকারের ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের আওতাভুক্ত এ মেট্রোরেল আগামী মার্চের মধ্যেই দৃশ্যমান হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আগারগাঁও থেকে মিরপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্পের দৃশ্যমান কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। রোকেয়া সরণির পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে মিরপুর পর্যন্ত সড়কের মাঝ বরাবর ব্যারিকেড দিয়ে এমআরটি প্রকল্পের কাজ চলছে দিনে রাতে ।

২০১৭-এর ২৬ জুন মেট্রোরেল প্রকল্পের লাইন ৬-এর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) দেবে ১৬ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। আর সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন হচ্ছে ৫ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা। প্রায় ২১

মেট্রোরেলের মডেল

কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রোরেল প্রকল্পে থাকবে ১৬টি স্টেশন। উত্তরা তৃতীয় ফেইজ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত এ প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ডাবল রেললাইন স্থাপন

বহু প্রতীক্ষিত ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে ডাবল লাইনের রেলপথ নির্মাণের কাজ ২০১৭-এর নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম স্থান হলো নারায়নগঞ্জ। ঢাকার সাথে এই এলাকার মানুষের যাতায়াত সহজতর করতেই মূলত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জ যেতে ১৫-২০ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শুদ্ধ জাতীয় সংগীত চর্চা অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী শিশু প্রতিযোগিতা

শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা চলছে। তথ্য অধিদফতর থেকে জানানো হয়েছে, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে শিল্পকলা একাডেমি অনুমোদিত জাতীয় সংগীতের সিডি/সফট ভার্সন (অডিও এবং টেক্সট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সিডি সরবরাহ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়ে নির্দেশাবলি সংবলিত একটি পরিপত্র জারি করেছে ।

২০ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শেষে ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলা পর্যায়ে, ২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি জেলা পর্যায়ে এবং ৫ থেকে ১১ মার্চ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হবে। ১৫ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । ২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর সালাম গ্রহণকালে একযোগে সারাদেশে ও প্রবাসে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হবে ।

শিশুদের ডিজিটাল পদচারণা সুরক্ষিত রাখতে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান ইউনিসেফ-এর

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি শিশু নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ' এমন তথ্য জানিয়েছে ইউনিসেফ। নিরাপদ ইন্টারনেট দিবসে শিশু এবং তাদের ডিজিটাল পদচারণা সুরক্ষিত রাখা জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানান ইউনিসেফ। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থাটি সতর্ক করে জানিয়েছে, ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার তাদের সামনে উপকার ও সুযোগের বিশাল দ্বার উন্মোচন করে। তবে একই সঙ্গে তাদের ঝুঁকি ও ক্ষতির মুখেও ফেলে, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর আধেয় (কনটেন্ট), যৌন হয়রানি ও শোষন, সাইবার উৎপীড়ন ও তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার। ইউনিসেফের ডাটা রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের পরিচালক লরেন্স চ্যান্ডি বলেন, অনলাইনে সবচেয়ে ভয়াবহ ঝুঁকিগুলো দূর করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নে সরকার ও বেসরকারি খাতগুলো কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে শিশুদের অনলাইন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে ও তা সুরক্ষিত করার জন্য আরো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

শিশুদের ডিজিটাল পলিসির কেন্দ্রে রাখতে সরকার, সুশীল সমাজ, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক শিশু সংগঠন এবং বিশেষভাবে বেসরকারি খাতের প্রতি নতুন করে জোরালো সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে পাঁচটি সুপারিশ করেছে ইউনিসেফ।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

২০৫০ সাল নাগাদ সূর্যের উত্তাপ কমবে

সূর্যের উত্তাপ ২০৫০ সাল নাগাদ কমে যেতে পারে । নতুন একটি গবেষণায় এ কথা বলা হয়। সোলার সাইকেল শীতল হতে থাকা অংশের উপর ভিত্তি করে সানডিয়াগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, কয়েক দশক পর সূর্য সাত শতাংশে শীতল হবে। কারণ তারা মনে করেন, 'গ্রান্ড মিনিমাম' পরিস্থিতি আসতে আর মাত্র কয়েক দশক সময় লাগবে। এই গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, গ্রান্ড মিনিমাম হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমাত্রার সৌর গতিবিধি যা পৃথিবীর তাপমাত্র হ্রাস করে। উল্লেখ্য যে, ১৭ শতকের মাঝামাঝিতে মুন্দার মিনিমাম নামে গ্রান্ড মিনিমামের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কমে এসেছিল যা টেমস নদীর পানিকে বরফে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

নুতন উদ্ভাবনের মাধ্যমে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতে অব্যাহত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় নতুন নতুন জাত ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে এ কথা বলেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ইপিআই বা সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির সাফল্য

ইপিআই একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংক্রামক রোগ থেকে শিশুদের অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা। ১৯৭৯

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

সালের ৭ এপ্রিল সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির ঘোষণা ও বাস্তবায়নের পর থেকে দেশে এক বছরের কম বয়সি সকল শিশুদের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির (ইপিআই) সফলতা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং সমাদৃত। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থানমূহের সকলের মাঠ-পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশে আজ শতকরা ৯৫ ভাগের ওপরে শিশুকে নিয়মিত টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ফলে শিশু মৃত্যুহার আজ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ টিকাদান কর্মসূচির ফলে প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ–শিশুদের যক্ষ্মা, পোলিও মাইলাইটিস, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগসমূহ, হাম, রুবেলা, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া ইত্যাদি এখন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ইতিপূর্বে পোলিও নির্মূলকরণের জন্য মুখে খাওয়ানোর যে ওপিভি টিকা দেওয়া হতো তাতে টাইপ-১, ২, ৩ তিনটির জন্যই ভ্যাক্সিন ছিলো। ১৯৯৯ সাল থেকে পোলিও টাইপ-২ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী না পাওয়ায় 'গ্লোবাল সার্টিফিকেশন কমিশন' গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর বিশ্বকে টাইপ-২ পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে। তাই এরপর থেকে টাইপ-২ এর স্থলে শুধু টাইপ-১ এবং ৩ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্য পোলিও ইরাডিকেশন অ্যান্ড গেম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৩-২০১৮ কর্মপরিকল্পনায় ওপিভি ব্যবহারকারী দেশগুলোকে এ বছরের এপ্রিল থেকে নতুন এই টিকা দিতে বলা হয়েছে। এটি টাইপ-১ ও টাইপ-৩ পোলিও নির্মূলে কাজ করবে।

জন্ম-মৃত্যু আছে, থাকবেই-এটাই সত্য। কিন্তু তাই বলে নিজেদের অজ্ঞতার কারণে, অবহেলার কারণে, অকালে ছোট্ট ফুটফুটে শিশুটিকে আর বাঁচানো গেল না বলে বসে থাকলে কি ঠিক হবে, আমাদের বিবেক বুদ্ধি-কি কোনো কাজে আসবে না, এতো হতে পারে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত তার সুফল থেকে তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে হাত গুটিয়ে কি আমরা বসে থাকব, তাতো হয় না। তাই সময় এসেছে নিজেদের বাস্তবের মুখোমুখি হবার, সময়ে এসেছে চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলার, নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যকেও সচেতন করার। সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসার।

জাতীয় টিকা দিবসে শিশুকে টিকা খাওয়ানো হচ্ছে

বর্তমানে বিশ্বে রোগ প্রতিরোধের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। ফলে শিশুরা সহজে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। টিকা একটি নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে

তোলে। রোগের ভিন্নতায় টিকা ও ভিন্ন ভিন্ন। যে সব রোগের টিকা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই শিশুদের জন্য। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি শুরু করার আগে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় আড়াই লাখ শিশু ৬টি রোগে মারা যেত। এর মধ্যে এক বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। দেখা গেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের রোগ ও মৃত্যুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। এদের তিন ভাগের একভাগ মারা যায় ডায়রিয়া রোগে, এক ভাগ ছয়টি প্রতিরোধযোগ্য রোগে এবং বাকি এক ভাগ অন্যান্য রোগে। তাই সময়মতো টিকা প্রদান করে শিশুদের মৃত্যু হার অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এজন্য সঠিক সময়সূচি অনুসরণ করে এবং ন্যূনতম বিরতি মেনে টিকা প্রদান করলে অনেক রোগ থেকে শিশুদের বাঁচানো সম্ভব হয়। অবশ্য টিকা কখন দেওয়া যাবে আর কখন টিকা দেওয়া যাবে না এ সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে জনসচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

দেশে সরকারি উদ্যোগে সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির (ইপিআই) কার্যক্রমসমূহের সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য মাঠ-কর্মীদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সঠিক বয়সে, সঠিক বিরতিতে ও সঠিক টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে মা-বাবা, অভিভাবকদের পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, পর্যালোচনা শেষে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। যা অভিভাবকদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইপিআই কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

দেশে সরকার আছে সরকার করবে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আছে মানুষের সেবা দিতে, এ দায়িত্ব তাদের এমন ধারণা নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখব এ কোনো সভ্য সমাজের কথা নয়। বর্তমান সরকারের এ কার্যক্রম যদিও প্রচুর সফলতা পেয়েছে তথাপি শিশু মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য-এ নীতিকে বুকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাবো, একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবো, দেশের জন্য সকলে মিলে কাজ করব, দেশ এগিয়ে যাবে, আমাদের সুদিন আসবে আমরাও উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবো এটাই আমাদের কাম্য।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তার চিরাচরিত অভ্যাস বা আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থার আলোকে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনছে যা মানুষকে উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে মানুষের মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন যেমন জরুরি তেমনি সেবা প্রদানকারী সংস্থাদের নিরলস পরিশ্রমের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব তার নিজ এলাকার নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যা সমগ্র জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এ প্রসঙ্গে প্রচার অভিযানের মাধ্যম ও উপকরণ হিসেবে ফ্লিপ চার্ট, মাইকিং, গান ও কবিতার স্লাইড প্রদর্শনী, আলোচনা এবং মিটিং করতে হবে ও হাটে-বাজারে বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার লাগাতে হবে। আর এসব প্রচারাভিযানে স্থানীয় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যেমন-শিক্ষক, ইমাম, চেয়ারম্যান, শিল্পী-সাহিত্যিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীবৃন্দ, মহিলা সংস্থা বা ক্লাবের কর্মীদের অংশগ্রহণ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ইপিআই কর্মসূচিতে সামাজিক সমর্থন, ইপিআই কাজে সহায়ক তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এবং টিকাদান কর্মীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়সমূহের সফল বাস্তবায়নই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এ জাতির পদার্পণ যা বাংলাদেশকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ হাসান জাফরী

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে বরাবরই বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয় আইনশৃঙ্খলাবাহিনীকে। ৩১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে জাতীয় পার্টির সাংসদ কাজী ফিরোজ রশীদ ছোটো ছোটো শিশু রাস্তায় মাদক নিচ্ছে এবং গুলশান, বনানী,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন-পিআইডি

বারিধারার মতো অভিজাত এলাকায় লাইসেন্সবিহীন নাইট ক্লাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা নেশা করছে বলে অভিযোগ করেন।

তাঁর অভিযোগ শুনার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাইক চালু না করে রাজধানীর কোন কোন এলাকায় এসব কাজ হচ্ছে তা জানতে চান। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলেন, 'মাননীয় সংসদ সদস্য যে কথা বললেন, আমি নোট নিচ্ছি। আজকেই অভিযান চালান। কারণ আমরা চাই না এ ঘটনা ঘটুক।'

প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া এবং অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা দেন। উল্লেখ্য, পয়েন্ট অব অর্ডারে কোনো সদস্যের বক্তব্যের পর সরকারপ্রধানের পক্ষ থেকে এমন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঘটনা বিরল।

মাদকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ

ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ সকল ধরনের মাদকদ্রব্য পরিবহণ, বিতরণ ও সেবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেশের সব জেলার ডিসি-এসপিকে অবহিত করতে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একই সাথে দেশের সীমান্তবর্তী জেলা কক্সবাজার ও বান্দরবানে সব ধরনের মাদকের অবৈধ প্রবেশ বন্ধের ব্যবস্থা নিতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত এক মাস পর পিবিআই'কে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলেছে। বিষয়টি ১ মার্চ পরবর্তী আদেশের জন্য রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'ইয়াবার গ্রামে কোটিপতি বাসিন্দা', শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ ২৯ জানুয়ারি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলসহ এ আদেশ দেয়।

রুলে ইয়াবা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য অবাধে প্রবেশ, পরিবহণ ও অবৈধভাবে বাজারজাতকরণ রোধে পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও সরকারের সংশ্লিষ্টদের 'নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা' কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পুলিশ মহাপরিদর্শক(আইজিপি), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের পুলিশ সুপার, টেকনাফের ওসি ও টেকনাফের ইউএনওকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

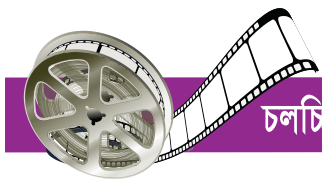

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতায় ৪ দিনব্যাপী বাংলাদেশ উৎসব ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। কলকাতার নন্দন চলচ্চিত্র কেন্দ্রের দু'নম্বর প্রেক্ষাগৃহে, কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারে তথ্য মন্ত্রণালয় এ উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত ছিলেন। ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি কলকাতার নন্দন কেন্দ্র ও নজরুল তীর্থে বাংলাদেশের ২৪টি সিনেমা এবং ৮৩টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

আলোকচিত্র প্রদর্শন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

২০১৭-এর সেরা এবং আলোচিত ছবিগুলো

নির্মাতা জয়দ্বীপ মুখার্জীর 'নবাব' চলচ্চিত্রটি ২০১৭ সালের সেরা ছবির তালিকায় স্থান করে নেয়। এতে অভিনয় করেন শকিব খান ও শুভশ্রী। পরিচালক বাবা যাদব পরিচালিত 'বস টু' চলচ্চিত্রটিও সেরা ছবির তালিকায় আছে। ছবিটিতে অভিনয় করেন জিৎ ও নুসরাত ফারিয়া।

নির্মাতা দীপংকর দীপন পরিচালিত 'ঢাকা অ্যাট্যাক' ছবিটিও সেরা ছবির তালিকায় স্থান করে নেয়। এতে অভিনয় করেন আরেফিন শুভ ও মাহি। এছাড়া ২০১৭ সালের আলোচিত ছবিগুলো হলো– ডুব, হালদা, অন্তর জ্বালা, সত্তা, প্রেমী ও প্রেমী, ভুবন মাঝি, ধ্যাৎতেরিকি, আপন মানুষ, সোনাবন্ধু, রাজনীতি।

পুনের উৎসবে বাংলাদেশের ৩ ছবি

ভারতে অনুষ্ঠিত হলো 'এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল পুনে'। এ উৎসবের অষ্টম আসরে বাংলাদেশের ৩ ছবি স্থান পায়। ছবিগুলো হলো– সোহাগীর গয়না, আয়নাবাজি ও ভয়ংকর সুন্দর। ছবি ৩টি 'স্পেকট্রাম এশিয়া' বিভাগে স্থান পায়। এ উৎসবে ১৫টি দেশের ৫০টি সিনেমা প্রদর্শিত হয়। ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে এ উৎসব।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সার্কেল'

পরিচালক শান্তনু হালদারের দ্বিতীয় প্রামাণ্য চলচ্চিত্র সার্কেল (আবর্তন) ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রটি উৎসবের স্পিরিচুয়াল বিভাগে ১৯ জানুয়ারি রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি বাংলার আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব কেন্দ্রিক। এ ছবিটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত খ্যাতিমান অভিনেতা দিলীপ চক্রবর্তীকে। যিনি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে ধারণকৃত জনপদের একজন ছিলেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান